দানশাহ
কি
বিশ্বাসঘাতক ?

এম. ইদ্রিস আলি

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল ঃ ১৬ই আষাঢ় ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ শ্রীদ্বিজদাস কর
অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ আব্দুল গোফ্‌ফার
হামেদিয়া প্রেস
রতুয়া, মালদহ।

হিন্দু-মুসলিম সকল জাতির পরম হিতৈষী বন্ধু
হজরত পীর দানশাহ রহমতুল্লা আলাইহের
স্মৃতির প্রতি—

যে তোমারে যাহা ভাবুক
আমি ভাবি পীর,
দানশাহ নাম অমর হোক
এই চির স্থির।

—গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

স্বপ্নঝরে	(কবিতা)
ভারতের মাটিতে	(ঐ)
জীবন যেখানে	(ঐ-প্রকাশিতব্য)
সত্যের সন্ধানে	(ধর্মীয় আলোচনা-প্রকাশিতব্য)

বিষয়সুচী

আশীর্বাণী

প্রিয় ইউনুস আলী,

কবি হইয়াও হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) কে লইয়া যে ইতিহাস প্রকাশ করিতে চলিয়াছ তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। এই দুর্দিনে মহৎ কাজে ব্রতী হইয়া বহু অর্থ ব্যয় সাধনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিগত দিনের অনেক জানা অজানা ঘটনাগুলোকে গ্রন্থিত করিয়া যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছ তার জন্য তোমাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া হজরত দানশাহ (রহঃ) এর ব্যাপারে যাহা জানিতে পারিলাম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) এর বংশধর হইয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট ইহাই প্রার্থনা করি—তোমার জীবন হোক পুণ্য-ধন্য। আর কামনা করি দেশ-বিদেশে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার।

হাজী মোহাঃ আলী হায়দার খাঁ

(প্রাক্তন জমিদার)

সাহাপুর, বাহারাল

মালদহ।

নিবেদন

যে ইতিহাস লেখা হয়নি এতদিন। হিন্দু-মুসলিম সকল জাতির পীর হজরত দানশাহ (রহমতুল্লা আলাইহে) কে নিয়ে একখানা গ্রন্থ রচনার অনেক দিনের আকাঙ্খা, কিন্তু এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি নানা কারণে। সময় চলে যায় তার নিয়মের রেখা ধরে—তাই মানুষের আয়ু আর কতক্ষণ ?

বিচিত্র জগৎ—বিচিত্র মানুষ। আর এই বিচিত্র জনস্রোতের ঢেউ-এ কত প্রভাবশালী নোতুন নামের আবির্ভাবে কত প্রাচীন মণি-মুক্তা যে অতীতের গহিন গর্ভে চাপা পড়ে গেছে, যাচ্ছে—সে কথা বলতে দ্বিধা নেই।

তবে এটাও সত্য যে অনেক দরদী বন্ধু ছুটে আসেন কোন কোন ঐতিহাসিক স্থানে কিংবা কানে শুনে দূর হতেই কলম ধরেন বিগত দিনের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সন্ধানে। কিন্তু দেখা যায় অনেকেই সেই অতীতের স্তূপ না খুঁড়ে না দেখেই দায়সারা কাজ করে যান নামকে উয়াস্তে। কেউ কেউবা আবার করে যান সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য। কিন্তু প্রথমেই ভেবে দেখা উচিত যে, সেটা প্রকৃত ইতিহাস না উপহাস। যদি সত্যই সে ইতিহাস তাহলে রচয়িতা সত্যিই সকলের শ্রদ্ধেয়। আর তা না হলে তিনি সমুদ্রের নাম বলতে পারেন, বলতে পারেন না তার তলদেশে মুক্তা অবস্থানের দৃশ্যাবলী—তিনি বলতে পারেন গ্রহ-নক্ষত্রের কাল্পনিক কাহিনী—কিন্তু তার বাস্তবরূপ স্রষ্টার মহাশূন্যেই বিরাজিত যুগ যুগ—অনন্তকাল। তাই শ্রদ্ধেয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী এবং জন মার্শাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ জন্ম না নিলে হয়তো আজও অতীতের অন্ধকারেই থেকে যেত সেই অপূর্ব নিদর্শন মহেঞ্জোদরো আর হরপ্পা।

যাই হোক যাঁকে নিয়ে আজকের এই ইতিহাস—যে ইতিহাস লেখতে গেলে প্রচুর সাধনা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই ইতিহাসে আমার মত এক নগণ্য নরাধমের পক্ষে হাত দেওয়া অনুচিত হলেও কালের গতিধারা দেখে বাধ্য হয়েছি কলম ধরতে—জানিনা এই নরাধমের রচনা কতটুকু

জ্ঞাত করাবে আপনাদের।

যাই-ই হোক এই গ্রন্থ রচনাকালীন যাঁরা অতীতের স্মৃতি মন্থন করে বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও বিভিন্ন দলিল-পত্রসহ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে সাহায্য করেছেন আমাকে, তাই আজকের এই নিবেদনে তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে গ্রন্থখানির সার্থকতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—তাই একে একে উল্লেখ করি ঐসব গুণী/জ্ঞানী গুরুজনদের নাম—শ্রদ্ধেয় হাজী মোহাম্মদ আলী হায়দার খাঁ সাহেব (প্রাক্তন জমিদার), মহঃ আতাউর রহমান খাঁ সাহেব (প্রাক্তন জমিদার), হাজী সেখ আব্দুল করিম, হাজী সেখ আব্দুর রেজ্জাক, শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীগুধন চন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস, সেখ ইব্রাহিম, হাজী মোহাম্মদ মকসুদ আলী (ডাক্তার), মহঃ আসরাফউদ্দিন মিজামী, সেখ দেরাসতুল্লা, হাফেজ সেখ আব্দুল আলিম, হাফেজ মহঃ মহিউদ্দিন খান, মৌঃ মইনুদ্দিন সিদ্দিকী, মোহাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান, মোহাঃ আবিত্তুর রহমান খান, মহঃ রহমত আলী শাহ, আলী মোহাম্মদ এবং মহঃ হাবিবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করায় আমি তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আরো রয়েছেন, যিনি—এম ডি. নুরুল ইসলাম অনেক পরিশ্রমে কয়েকবার কলকাতা গিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে এই গ্রন্থের বহুমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য এনে দিয়েছেন এবং বন্ধু আব্দুর রশিদ ও মহঃ আফিসুদ্দিন খান্দানী সাহেব মাটির ভেতর থেকে পাওয়া প্রাচীন কালের বেশ কিছু নিদর্শন এনে দিয়ে গ্রন্থখানিকে যে প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছেন এর জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিশেষ করে কৃতজ্ঞ ও ঋণী রয়েছি তাঁর কাছে, যিনি কোলকাতা অণিমা প্রকাশনীর পাবলিসার্স শ্রদ্ধেয় শ্রীদ্বিজদাস কর মহাশয় এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ও সংগৃহীত বস্তু সমূহের ছবির ব্লকগুলো তৈরী করিয়ে সুদূর কোলকাতা থেকে মালদহে স্বহস্তে এনে পৌঁছে দিয়েছেন এবং গ্রন্থখানির প্রকাশের দায় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করে ধন্য করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আরো কয়েক জনের নাম না করলেই বুঝি অসম্পূর্ণ থেকে যায়—গ্রন্থখানি রচনায় যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়ে আসছেন তাঁরা হলেন শ্রীসুধীর চন্দ্র পাল, মহঃ ওয়াহেদ আলী, মহঃ আসগর আলী, এস কে, জালালুদ্দিন আহমেদ, শ্রীসীতেশ চন্দ্র রায়, শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মিশ্র এবং আব্দুস সাত্তার প্রমুখ শিক্ষকগণের আন্তরিক উৎসাহদানের জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাবনত।

আগেই বলেছি আমার মত নগণ্য-নরাধমের পক্ষে এই মহান কাজে হাত দেওয়া অনুচিত তবুও প্রয়োজনে হাত দিতে হয়েছে। গ্রন্থখানি ছাপা কালীন প্রয়োজনবোধে রতুয়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় মহঃ আসরাফউদ্দিন নিজামী সাহেব তাঁর জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে গ্রন্থখানির বেশ কিছু জায়গায় পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করে প্রুফ দেখে দিয়ে ধন্য করেছেন, তাঁর আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কোন ঐতিহাসিক নই। যা দেখেছি যা পেয়েছি—তা দিয়েই এই গ্রন্থের সূচনা। কিছু ভুল ক্রটী হয়ে যায় তাই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ছাপাকালীন দুই রাকাত সুকুরাণা নমাজ পড়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি—প্রভু! আমার মত এক নগণ্য-নরাধম এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছে, মিথ্যাকে দূরে সরিয়ে সত্য যেন সত্যরূপে প্রকাশ পায়—আমার অজ্ঞাতে অসাবধানতার জন্য যদি কোথাও ক্রটী হয়ে যায় তাহলে তুমি আমায় ক্ষমা কর! তুমি আমায় শক্তি দাও! আমীন!

তাই সুহৃদ পাঠকগণের কাছে আমার অনুরোধ—রচনায় যদি কোথাও আমার অসাবধানতার জন্য কিছু ক্রটী হয়ে যায় তাহলে এই হতভাগ্য আপনাদের কাছেও ক্ষমা প্রার্থী। মফঃস্বল এলাকায় ফটোগ্রাফার না পাওয়ায় গ্রন্থখানির ছবিগুলো নিজ ক্যামেরায় স্বহস্তে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি। যার ফলে আনাড়ি হাতের ছাপ পড়েছে বেশ কিছু ছবিতে। যাই হোক এটিকেও আনাড়ি হাতের পরশমণি ভেবে যদি আপনারা গ্রহণ করে নেন তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

গ্রন্থখানি আরো কলেবরে প্রকাশের সাধ থাকা সত্বেও অর্থাভাবে সাধ্য হলনা আমার। আগামীতে দ্বিতীয় সংস্করণের ইচ্ছা থাকলো, সাধ্যমত চেষ্টা করবো আরো কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে গ্রন্থখানিকে

বৃহৎ আকারে প্রকাশ করার। আজ কেবল প্রত্যুষের শিশিরকে যদি আপনারা একটা সময়োপযোগী বর্ষণ ভাবেন তাহলে এই নরাধমের কাছে জীবন অবগাহনের এক পবিত্র সমুদ্র বলে মনে হবে।

আজকের এই নিবেদনের ইতি টানতে গিয়েই মনে পড়ে দুই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির স্মৃতিকথা। গ্রন্থের বেশ কিছু তথ্যপ্রদানকারী শ্রদ্ধেয় হাজী সেখ আব্দুল করিম ও শ্রদ্ধেয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় সম্প্রতিকালে পরলোকগমন করায় এবং গ্রন্থখানি বিলম্বে প্রকাশ ঘটায় উক্ত দুই ব্যক্তির হাতে গ্রন্থখানির কপি তুলে দিতে পারিনি বলে ভীষণভাবে দুঃখিত।

যাই হোক, আজকের এই ইতিহাস না প্রবন্ধ. না আলোচনামূলক আর কিছু হয়ে দাঁড়ালো—তার বিচারের ভার একমাত্র সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার হাতে। এর সমস্ত ভুল ভ্রান্তি মেনে নিয়ে গ্রন্থখানি যদি জনসমাজে সমাদর লাভ করে তাহলেই জানবো—শ্রম সার্থক হয়েছে।

গ্রন্থকার

এম ডি, ইউনুস আলি
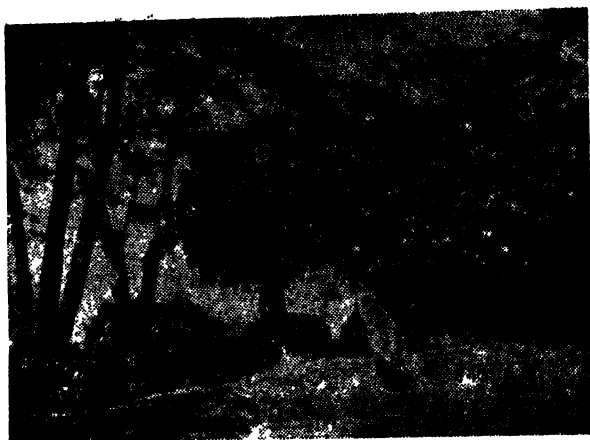
সূচনা

ছবিতে যে উঁচু জায়গাটা দেখছেন যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু অতীতের নাম না জানা গাছগুলো! যাদের কোনটির পাতা বেশ বড়, কোনটি মাঝারি কোন কোনটি ছোট ছোট এবং গোল গোল, আবার কোনটি লম্বাকৃতি। এরা কিন্তু সবাই অতি প্রাচীন যা আজো অতীতের ঐতিহ্য বহন করে আসছে—যার ইতিহাস আজো কেউ লেখেনি কোন কাগজের পৃষ্ঠায়।

কিন্তু কথা বলছিলাম ঐ উঁচু জায়গা অর্থাৎ টিবিটার কথা। যার সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে সেই প্রাচীন কালের ছোট-বড় ইট পাথরের ভিড়। আর এই ভিড়ের উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বড় পাতাযুক্ত গাছ, যার নাম আজো এখানকার মানুষের ধারণার বাইরে। গাছটি লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন তার শিকড়গুলো যেন কোন এক প্রেমের আকর্ষণে জড়িয়ে রেখেছে টিবিটার চারধার। আর তারই গোড়াতেই পড়ে রয়েছে বেশ কিছু ছোট বড় প্রাচীন ইট-প্রস্তর খণ্ড। এই প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও ইটগুলো যে কে কবে এখানে এনেছিলেন তার হদিস আজও পাওয়া মুস্কিল।

যেই এসে থাকুন না কেন আজ এই জায়গাটির বিবৃতি দিতে গিয়েই মনে পড়ে—কে জানতো যে একদিন এই জায়গাটি এক পরম পবিত্র ঐতিহাসিক স্থান বলে চিহ্নিত হবে ? জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সবাই এখানে ছুটে আসবেন নিজ নিজ দুঃখ-দুর্দশা, নানা ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার আবেদন জানাতে; মানত্ (মানস্তি) করে যাবেন যার যা ইচ্ছা—আবার একদিন মনের আনন্দে ছুটে আসবেন মানত্ পরিশোধ করতে। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার মানত্ পরিশোধ করা কালীন হাতজোড় করে বলবেন—হে পীর ! পরম করুণাময় আল্লা বা ঈশ্বরের কৃপায়, আপনার আশীর্বাদে আমি বা আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রোগমুক্ত হয়েছি, আপনার নিকট যা মানত্ করেছিলাম আজ তা দিতে এসেছি; আপনি গ্রহণ করুন !

অথচ দেখুন. এত বড় এই পবিত্র ঐতিহাসিক স্থানটির আজো কেউ রক্ষণা-বেক্ষণ করার মানুষ নেই, নেই পবিত্র স্থানটির চারপাশ ঘেরা-বেড়া. নেই কোন স্মৃতিসৌধ, আজো দলে দলে গরু-ঘোড়া চরছে, বিচরণ করছে অহরহ—তবুও কোন হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয় টলে উঠেনা।

আপনি কি এই পবিত্র ঐতিহাসিক স্থানটি দেখতে চান ? তাহলে চলে আসুন ! এই পবিত্র স্থানটিতে যিনি সমাধির মধ্যে পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন তাঁর নাম ও পরিচয় বলছি পরে, যাঁর পবিত্র নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত, আবার অনেকে হয়তো কিছুই জানেন না। না জানাটাই স্বাভাবিক। কারণ, পৃথিবীর বুকে এমনি কত মহামূল্য রত্ন এবং ঐতিহাসিক স্থান যে তার ইতিহাস না থাকার দরুণ কালের ফাটলে চাপা পড়ে গেছে তাই বা কে জানে! যাই হোক বলছিলাম এই স্থানটি পরিদর্শনের কথা।

মালদহ টাউন থেকে যে কোন বাস ধরে চলে আসুন। হরিশ্চন্দ্রপুর. ধুলিয়ান—কুশিদা, রায়গঞ্জ—চাচোল কিংবা রতুয়া, ভালুকাগামী বাস ধরে এসে, নেমে পড়ুন বাহারাল ম্যারাথন মোড়ে। এই মোড়টি কিন্তু চৌরঙ্গী মোড়। বাস থেকে নেমেই দেখতে পাবেন চার রাস্তা চার দিকে চলে গেছে। উত্তর দিকে পাকা সড়ক চলে গেছে রতুয়া, সামশী. চাচল প্রভৃতির দিকে। দক্ষিণে চলে গেছে নুরপুর ব্যারেজ পার হয়ে মথুরাপুর,

মাণিকচক, মালদহ প্রভৃতির দিকে এবং পূর্ব দিকে চলে গেছে পুরাণপুর, আড়াইডাঙ্গা, মাদিয়া ঘাট পেরিয়ে মালদহ টাউন। এবারে বাকি থাকে আপনার পশ্চিম দিককার রাস্তাটি। এই রাস্তাটি কাঁচা হলেও আজ তার উপর ইট বসানো হয়েছে। এখন এই রাস্তাটিই আপনাকে হাঁটতে হবে, হাঁটতে হবে মাইল দু'এক মাত্র।

আপনি এই রাস্তা না হেঁটে, বাহারাল মোড়ে বাস থেকে না নেমে সোজা-সুজি রতুয়াতে গিয়েও নামতে পারেন। কারণ; সেখান থেকে ঐ পবিত্র স্থানটি বেশ নিকটে। কিন্তু বাহারাল মোড় থেকে এই পশ্চিমমুখী রাস্তাটির কথা বলছি এই কারণে যে, এই রাস্তাটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু ঘটনা, যা শুনলে হয়তো আপনিও অবাক হয়ে উঠবেন। কেননা, যাঁর সমাধি স্থলে পরিদর্শনে চলেছেন, তাঁরই সেই প্রাচীন বসত-ভিটা খানিক দূর এই পথে হাঁটলেই দেখতে পাবেন। শুনতে পাবেন আরো অনেক কিছু।

হ্যাঁ, বাহারাল মোড় থেকে সোজা পশ্চিমে ইট বসানো রাস্তা ধরে হাঁটুন। আপনার সামনেই পড়বে ব্রাহ্মণপাড়া অর্থাৎ বাহাদুরপুর। বাহাদুরপুর পার হলেই প্রবেশ করবেন সাহাপুর মৌজার পথে। খানিক দূর হাঁটলেই আপনার বাঁদিক নজরে পড়বে 'হাবেলি' নামক একটি জায়গা। এই জায়গাটিই হচ্ছে যাঁর পবিত্র সমাধি স্থলে আপনি যাচ্ছেন—তাঁরই এক সময়কার বসতভিটার ধ্বংসাবশেষ। এ ভিটার কথায় আসছি পরে, এখন পশ্চিমাভিমুখী ইট বিছানো পথ ধরে হাঁটুন। খানিক হাঁটলেই সামনেই দেখতে পাবেন সাহাপুর বড় জুমা মসজিদ। এখান থেকেই আপনাকে বাঁক নিতে হবে সোজা উত্তর মুখে অর্থাৎ ডান দিকে। আর কিন্তু কোথাও আপনার পায়ে ইট ঠেকবেনা, এখন কাঁচা পথেই কিছুদূর হাটতে হবে।

ভয় পাওয়ার কিছু নয়। খানিক হাঁটলেই রাস্তার দু'ধারে আপনার চোখে পড়বে আম বাগান আর বাগান। তারপর চোখে পড়বে এলোমেলো অসংখ্য তালগাছ। আগে যেখানে গভীর অরণ্য ছিল, ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট, শিমুল, পলাশের ভিড়, দিনে যেখানে শোনা যেত

বাঘের গর্জন, এখন কিন্তু সেসব বালাই নেই ; আছে শুধু পরিস্কার আম বাগান আর তাল বাগান। তাই এই এলাকার বর্তমান নাম 'তালবনা'।

আপনি হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করবেন, আপনার রাস্তার বাঁ পাশে দেখা দেবে একখানা রহট (কুপ)। এই কুপটিও বেশ কিছু দিনের। যিনি এই কুপের নির্মাতা তিনি আজ আর নেই, পীর সাহেবের দরগাহে জলাভাবের কষ্ট থাকার দরুণ বাহারাল, বাহাদুরপুর গ্রামের ৺মনোমোহন সিংহ মহাশয় এই কুপের নির্মাণ কার্য্য করেন। হ্যাঁ, আপনি এই কুপের কাছেই থেমে যান।

দানশাহর দরগাহ

এখন কুপ সংলগ্ন উত্তর ও পশ্চিম মুখে তাকান। আপনার চোখে পড়বে বেশ উঁচু জায়গা। যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ ছোট বড় নাম না জানা গাছগুলো। আপনার পায়ে জুতো কিংবা স্যাণ্ডেল থাকলে কুপের খানিক দূরে রেখে এবারে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান ঐ উঁচু জায়গাটির কাছাকাছি। দেখবেন একটি বড় বড় পাতাযুক্ত গাছ ছায়ারূপী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমাধির উপর। আর, তার শিকড়গুলো যেন টিবিটার চারদিক থেকে বেস্টন করে রেখেছে কোন এক প্রেমের আকর্ষণে। আর
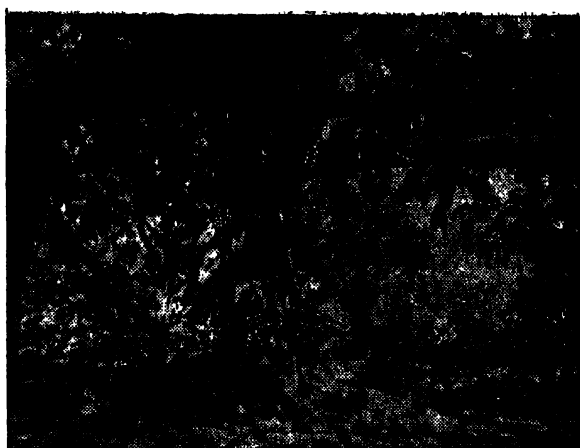
দানশাহর সমাধি স্থান

তারই গোড়ায় পড়ে রয়েছে সেই প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও ইঁটগুলো। এটিই হচ্ছে আপনার পরিদর্শনের পবিত্র ঐতিহাসিক স্থান। যে স্থানের নাম আজ কিছু নাম কেনা নবীন ঐতিহাসিকদের মতে নাকি কলঙ্কিত অর্থাৎ বিদ্রূপের বস্তু।

হয়তো ভাবছেন, এই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে 'কলঙ্ক' এবং 'বিদ্রূপ' শব্দটি এল কেন? সেসব কথায় আসছি পরে। আসুন, এখানে আরো একটি প্রাচীন শহরের কথা আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আপনি যে উঁচু জায়গাটি অর্থাৎ সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক তার পশ্চিম দিকে খানিক দূরে লক্ষ্য করুন—দেখতে পাবেন মরা 'কালিন্দ্রী' নদী। এই নদী একদিন কুল কুল রবে দক্ষিণাভিমুখে নাজিরপুর আজগুবির কাছে বাঁক নিয়ে আবার পূর্ব মুখে নুরপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। এখন ভালুকার কাছে বাঁধ এবং নুরপুর ঘাটে ব্যারেজ আর সাহাপুর, কাহালা ঘাটের উপর সুউচ্চ বাঁধ হয়ে যাওয়ায়, এই নদীর জীবন স্রোত একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছে, পরিণত হয়েছে বিরাট জলাশয়ে—দুই পাড়ে গড়ে উঠেছে ধান, কলাই প্রভৃতির মাঠ।

হ্যাঁ, বলছিলাম শহরের কথা। এখন আপনার চোখের দৃষ্টি দেন

যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তারই উত্তর দিকে। আপনি দেখতে পাবেন আপনার কাছ থেকেই বেশ কিছু এলাকাজুড়ে ফুলে ফেঁপে চলে গেছে বেশ কিছু দূর প্রায় একই সমান্তরালে—একেবারে রতুয়া সরকারী ডাক বাংলোর কাছাকাছি, আপনি যদি এই উঁচু জায়গা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন, তাহলে আপনার চোখে পড়বে সেই প্রাচীন যুগের ছোট বড় গেউড়িয়া ইঁটের টুকরো। কোথাও চোখে পড়বে সে যুগের কারুকার্য্য করা বিভিন্ন চীনামাটি এবং পোড়া মাটির বাসনের টুকরো; নানা ধরণের মাটির পুতুল এবং আরো কিছু পুরনো নিদর্শন।

বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি এবং এখনো শুনে আসছি যে, এইটিই ছিল একদিন 'কুতুব শহর'। কে এখানে কুতুব ছিলেন, কে এখানে রাজা ছিলেন তা বলা শক্ত। তবে গৌড়ের আমলেই কিংবা তারো অনেক আগেই একটি ছোট্ট শহর গড়ে উঠেছিল। তবে কয়েকটি সুত্রে বলা যেতে পারে যে, হয়তো 'কুতুব' নামীয় কোন রাজা বা দেওয়ান থাকতে পারেন। পারেন এই কারণে যে, ঐ যে আপনার পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখুন—যেখানে এখন গড়ে উঠেছে সরকারী কলোনী। তারই সংলগ্ন উত্তর পাশে চার পাড় উঁচু হয়ে রয়েছে সেই যুগের এক পুকুর। যে পুকুরে প্রবেশ করতে একদিন, দিনেও মানুষ ভয় পেতো। যার চার পাড়ে ছিল ঘন অরণ্য, ছিল বিরাট বড় বড় বট, শিমূল, তাল প্রভৃতির ভিড়। আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে চার পাড়। যার বর্তমান নাম 'আলপাড়া পুকুর'।

কিন্তু আসলে এর নাম তা ছিল না। ছিল 'রাণী পুকুর'। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথেই অনেক কিছুরই নাম বদলে যাচ্ছে, তাই 'রাণী পুকুর' থেকে 'আলপাড়া' পুকুরে পরিণত হয়ে গেছে ঐ আলপাড়া মৌজারই টানে। যাই হোক শুধু রাণী পুকুরই শেষ কথা নয়। এই এলাকায় ছিল আরো 'রাণী' নামীয় কয়েকটি তালগাছ। ওইসব তালগাছ আজ বেঁচে না থাকলেও 'রাণী' নামীয় একটি তালগাছ আমারই জমির আলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতি বছর ফল দান করছে, আজো রাণী গাছের তালকুন মুখে দিয়ে অনেকেই 'রাণী' নামটি স্মরণ করে থাকেন। কিন্তু কোন্ সময়কার কোন্ রাণী নামের সাথে এর

পরিচিতি—তা আমাদের জানার বাইরে।

যাই হোক এখন বোঝা যাচ্ছে যে, কুতুব থেকেই কুতুব শহর, রাণী থেকেই রাণী পুকুর এবং রাণী তাল হয়েছিল। হয়তো ঐ পুকুরে রাণী স্নান করতেন আর যে কয়েকটি তালগাছের তাল খেতে রাণী ভাল বাসতেন তাই তাঁর নাম থেকেই নাম হয়েছিল রাণী তাল। আর এ কথাও ঠিক এখানে যে একটা শহর ছিল তার বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে। আগেই বলেছি মাটির ভেতর থেকে পাওয়া যায় গেউড়িয়া ইঁট, নানা ধরণের কারুকার্য্য করা চীনামাটির বাসনের টুকরো, নানা ধরণের খেলনার সামগ্রী। শুধু তাই নয়—শোনা গেছে অনেকেই নাকি মাটি খননের কাজে এসে, এখানে পেয়েছেন সেযুগের বেশ কিছু টাকা পয়সা; পেয়েছেন সোনা দানা। মনে হয় এখনো সমীক্ষা চালিয়ে মাটি উলোট পালোট করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালে হয়তো অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারে। এই তো মাস দুয়েকের কথা। জনৈক ব্যক্তি মাটি খননের কাজে পেয়েছেন বেশ কিছু সীসার সন্ধান। বেশ কয়েকখানা সীসার ইঁট পেয়েছেন, যার এক একটির ওজন ৩৬ কিলো ৩৮ কিলো, কোন কোনটার উপর নাকি কি কি সব লেখাও আছে সেযুগের।

বহু পরিশ্রমে এক ব্যক্তির কাছ থেকে উক্ত সীসার ইঁট সংগ্রহ করে তার অর্দ্ধাংশের ফটোগ্রাফি দেওয়া হল। অর্দ্ধাংশ এই কারণে যে, যাঁরা এই সীসার ইঁটখানা সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা দু'জনে দু'ভাগে ভাগ করে নেন। ভাগের আগে এটির ওজন ছিল ২১ কেঃজিঃ, যার ওপর ইংরাজীতে লেখা ছিল '31'।
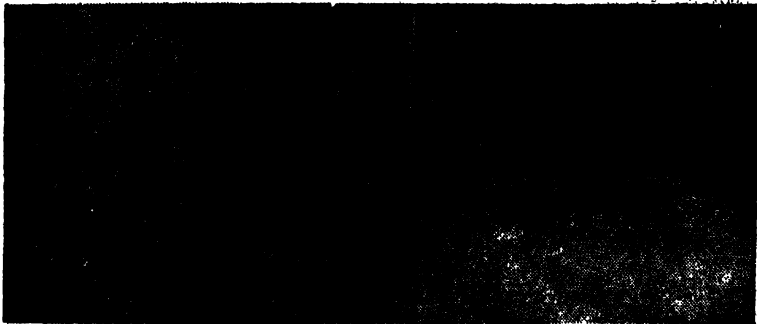
বর্তমানে রতুয়া নিবাসী সাহিত্যিক বন্ধু আব্দুর রশিদ এই এলাকা পরিদর্শনে পেয়েছেন সে যুগের পাথরের তৈরী কুকুর। কুকুরটির দৈর্ঘ্যতা প্রায় ২½ ইঞ্চি, লেজ নেই—লেজ খানা ভেঙে কবে কোন্ যুগে কোন্ মাটির সাথে মিশে আছে তাই বা কে জানে। কিন্তু তার গতি দেখে মনে হয় ছুটে চলেছে কোন শিকারের উদ্দেশ্যে। যার ফটোগ্রাফি দেওয়া হয়েছে।

রশিদ সাহেব যে বেশ কিছুদিনের পরিশ্রমে শুধু পাথরের কুকুরটি পেয়েছেন তা নয়, তিনি আরো পেয়েছেন প্রায় তিন ইঞ্চি স্কোয়ার পাথরের মধ্যে মহাবীরের খোদাই করা মূর্তি। যার ফটোগ্রাফি নিম্নে দেওয়া হল।
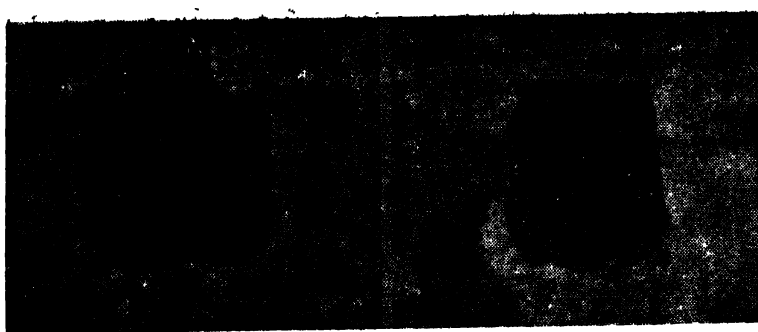
সামনের দিক পেছনের দিক

ক্যামেরায় স্পষ্ট ছবি না এলেও পাথরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মহাবীর ধ্যানরত অবস্থায় বসে আছেন আর তাঁর দুপাশে দুইজন নর্তকী নাচের ঢংয়ে মহাবীরের ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টা করছে। বলা বাহুল্য যে পাথরখানা সাধারণ পাথর নয়—এটি হচ্ছে কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরটি দেখে মনে হয়, আরো অনেক বড় ছিল। কারণ এর চারধারে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় আরো মূর্তির চিহ্ন—এটা যে একটি মূল পাথরের ভাঙা অংশ তা দেখলেই সহজে অনুমান করা যায়। পাথরটির পেছন দিকে সুন্দর খোদাই করা নক্সার মধ্যে নর্তকীর মূর্তি এটাও এক আকর্ষণীয়—চোখে না দেখলে সে যুগের প্রাচীন সভ্যতার এই কারুকার্য্য বোঝানো সম্ভব নয়।

আব্দুর রশিদ ছাড়াও কিছুদিন আগে রতুয়া রুকুন্দিপুর গ্রামের বিজ্ঞানের ছাত্র মহঃ আফিলুদ্দিন খান্দানী. খুন্তি কোদাল নিয়ে কুতুব শহরের কিছু নিদর্শন খুঁজতে গিয়ে যা যা পেয়েছেন নিম্নে তার ফটোগ্রাফি দেওয়া হল।
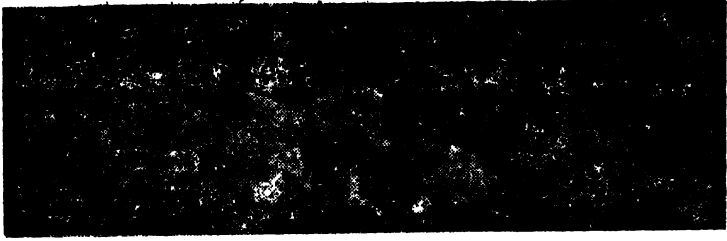
হজরত দানশাহর সমাধির উত্তর দিকে মাটি খনন করে তিনি পেয়েছেন বেশ কিছু সেযুগের পাথর, যার এক একটির রঙ এক এক ধরণের। কোনটা খয়েরী, কোনটা কালো, কোনটা লাল আবার কোনটা ধবধবে সাদা। এই শ্বেত মার্বেলগুলো দেখে মনে হয় এই শহরে শ্বেত মার্বেল দিয়ে ঘরেরকাজও করানো হয়েছিল। কোন কোন পাথরের গায়ে দেখা যায় বেশ চিকন গোলাকারে কাজ করা। মনে হয় এগুলো কোন ঘরের থামের ভাঙা অংশ। এবং এগুলো পাথর ভাঙলে তার ভেতরে পরিলক্ষিত হয় দানা দানা টল টলে পারার মত উজ্জ্বল রং। আরো দেখার মত রয়েছে—বেশ কিছু এক জাতীয় পোড়া মাটি ও পাথরের বাসনের টুকরোর গায়ে সে যুগের বিভিন্ন রঙের কাজ। কোন কোন টুকরোর গায়ে সবুজ ও সোনালী রঙ যা দেখলেই মনকে আকৃষ্ট করে। আরও আকৃষ্ট করে খান্দানী সাহেবের পাওয়া সে যুগের ইটের গায়ে সুন্দর ফুলের (নক্সা করা) কাজ। ফটোগ্রাফিতে যে রাজহাঁসখানা দেখা যাচ্ছে, সেটি মনে হয় হাতীর দাঁতের তৈরী এবং এটা বেশ কিছুদিন আগে আফিলুদ্দিন সাহেব পেয়েছিলেন ঐ দানশাহর সমাধির কিছু দূরে। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর মুখে শোনা গেল তিনি সেই সময় মাটি খননের ফলে

পেয়েছিলেন সে যুগের পাথরের 'নাদ'। আর ঘরের মেঝের কিছু ভাঙা অংশ—যার উপর এমন প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করা ছিল যে বর্ণনা দিতে গিয়ে খান্দানী সাহেব বলেন, 'আজকের আধুনিক যুগেও ঐ ধরণের কাজ চোখে পড়ে না।' সেই নাদ এবং মেঝের টুকরোর সন্ধান চাইতে গেলে তিনি বলেন—তাঁর দুই বন্ধু নিজ বাড়ীর মানুষদেরকে দেখাতে নিয়ে গিয়ে হজম করেছে ; বার বার চেয়েও আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি দানশাহর সমাধির কাছে আরো পেয়েছিলেন সে যুগের ইঁটের গায়ে বেশ কিছু লেখা, যা জনৈক বন্ধু কোন মৌলভী সাহেবের কাছে পড়াতে নিয়ে গিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি। যাই হোক বিজ্ঞানের ছাত্র মহঃ আফিলুদ্দিন যে অতীতের কুতুব শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু নিদর্শন কুড়িয়ে এনেছেন এটাই তাঁর শান্তি নেই, তাঁর মনে অনেক আশা অনেক ভরসা যে এখানে অতীতের ধ্বংসস্তূপে অনেক কিছুই হাজার হাজার বছরের সভ্যতা লুকিয়ে আছে। এই আফিলুদ্দিন সাহেবের জীবনও এক বিচিত্রময়। অতীতের গর্ভ থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করার আগ্রহ থাকা সত্বেও তিনি সামান্য কীট-পতঙ্গের জীবনকে নিয়েও দিনের পর দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন। কিছুদিন আগে জঙ্গল থেকে বিরাট লার্ভা সংগ্রহ করে অতি যত্নে ঘরে রেখে তার ভেতর থেকে বারো ইঞ্চির স্ত্রী মথ-এর জন্ম দেওয়ানোটাই খুব বড় নয়—ঘটনাটা বড় সেখানেই যে কোথা থেকে আর এক বার ইঞ্চির পুরুষ মথ ঘরের জানালা দিয়ে প্রবেশ করে খান্দানী সাহেবের মানস কন্যা মথ রাণীকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার এবং খান্দানী সাহেবের হাতের আঘাতে দুই মথের মৃত্যুর ঘটনা আমাদের কাছে সহজ হলেও খান্দানী সাহেবের কাছে যে কত বেদনা দায়ক তা একমাত্র খান্দানী না হলে কেউ বুঝতে পারে না। তাঁর যে মানস কন্যা হাতের আঘাতে মারা গিয়েছিল, সেই বারো ইঞ্চি মথের ছবি আজো তাঁর খাতায় বিরাজিত।

কুতুব নামীয় কোন রাজা-দেওয়ান যে ছিলেন তা আরো কিছু প্রাপ্ত সুত্রে জানা যায় যে, কালিন্দ্রী নদীর পশ্চিম পাড়ে বর্তমান আরাজি হরগোবিন্দপুর ব্যাড়ি বাগিচা (অর্থাৎ বড় বাগান) নামক জায়গায়

কুতুবশাহ্ তাব্‌রেজীর একখানা মসজিদ ছিল। তাব্‌রেজীর পর একদা কোন কারণে উক্ত মসজিদ মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। কালক্রমে তার ধ্বংসাবশেষের উপর ক্রমে ক্রমে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক বটবৃক্ষ। যে বটবৃক্ষ নাকি মালদহ জেলায় সর্ববৃহৎ ছিল।

যাই হোক কুতুবশাহ্ তাব্‌রেজীর পর এই এলাকার মালিক হন আব্দুল্লা খাঁ। পরে খাঁ সাহেবের হাত থেকে মালিকানা চলে আসে শাহ্ গোলাম আলীর হাতে। তাঁর হাত থেকে শাহ্ কুতু বক্স এবং কুতু বক্স-এর হাত থেকে শাহ্ জোনাব আলীর হাতে

কাহালা গ্রাম নিবাসী শাহ্ জোনাব আলী যখন উক্ত বটবৃক্ষের গোড়া খুঁড়িয়ে গাছটি কাটান তখন তার গোড়া থেকে একের পর এক বের হতে থাকে সেই যুগের গৌড়ীয় ইঁট। খননের সময় ইটের গাঁথুনি ও ঘরের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখে শাহ্ জোনাব আলীর স্মরণ হয় তাঁর পূর্ব পুরুষদের কথা। তাঁরাই বলেছিলেন যে, এই স্থানে কুতুব শাহ্ তাব্‌রেজীর মসজিদ ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই জোনাব আলী সাহেবের ধারণা যে এই মসজিদটি হয়তো কুতুব শাহ্ তাব্‌রেজীর মসজিদ ছিল।

কিন্তু কথা হল মাটি খননের পর যে প্রাচীন ইঁটগুলো বের হতে লাগল, এইসব ইট কি কাজে লাগানো যাবে এই নিয়ে শাহ্ জোনাব আলী ভাবতে থাকেন এবং এক রাত্রে কে যেন স্বপ্নে তাঁকে বলে যান—ইটগুলো যেন সৎকাজে লাগানো হয়।

তাই শাহ জোনাব আলী স্বপ্নকে করলেন বাস্তবে পরিণত। মাটির ঢিবি থেকে যত ইট পাওয়া গেল তা দিয়ে তৈরী করলেন তিনি এক 'ঈদগাহ'। ঈদগাহের চারদিককার প্রাচীর তৈরী করার সময় কিছু ইঁটের ঘাটতি পড়ায় তিনি তাঁর ইঁটের ভাটা থেকে কিছু ইট লাগিয়ে ঈদগাহের কাজ সম্পূর্ণ করান। জীবনের শেষ দিকে হজ করার পর সর্বসাধারণের গোরস্থানের জন্য উনিশ বিঘা সম্পত্তি দান করে শাহ্ জোনাব আলী ১০৫ বছর বয়সে ১৯৫৫ সালে পরলোকগমন করেন। যাঁর তৈরী করানো ঈদগাহ আজো তাঁর পুত্র রহমত আলী শাহ্ সাহেবের বাড়ীর খানিক দূরেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ রয়েছে।

এই কুতুব শহর নিয়ে অনেকের মুখে অনেক কিছুই শোনা যায়। আজ এই উঁচু এলাকাজুড়ে চাষ আবাদির কাজ হয়ে অনেক নিদর্শনগুলো সরে পড়েছে যেখানে সেখানে, গড়ে উঠেছে প্রায় সমস্ত এলাকাজুড়ে বাগাম আর বাগান। হয়তো এই প্রাচীন ধ্বংস শহরটির অতীতের গর্ভে কত প্রাচীম সভ্যতার নিদর্শন যে চাপা পড়ে আছে তাই বা কে জানে!

যাকগে, শহর এবং রাণীর পরিচয় পরিহার করে এখন আসা যাক ঐ পবিত্র ঢিবিটার কাছে। আগেই বলেছি এটা একটা অতি প্রাচীন সমাধি স্থল। যে সমাধির উপর কোম স্মৃতিসৌধ নেই, মেই চারপাশ ঘেরা-বেড়া, আছে শুধু ঐ ছায়াদামকারী বৃক্ষকুল আর চারদিক ফাঁকা আর ফাঁকা।

কিন্তু জানেন তো! কোন্ মহান ব্যক্তি এই সমাধির মাঝে চিরশায়িত রয়েছেন ? তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন সেকাল একাল লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, নানা জটিল রোগের রোগ নিরাময়কারী, আপনার আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, আল্লার প্রেরিত বান্দা হজরত পীর 'দানশাহ'।

'দানশাহ' নাম শুমেই হয়তো অমেকেই চমকে উঠলেন, তাই না ? হয়তো ভাবছেন কোম্ দামশাহ! যে দানশাহ কি একদা বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌলাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেম, সেই দানশাহ ? হ্যাঁ, সেই দানশাহ। তবে তিনি সিরাজকে প্রকৃত ধরিয়ে দিয়েছিলেন কি না, সেই নিয়েই তো আজকের এই আলোচনা। এমনি তো প্রায়ই দেখা যায়, আজ অনেকে ঘরে বসে এক এক বিষয়ের উপর ডিগ্রী নেওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন। অতীতেও যা ঘটেছে এখনো তা বিদ্যমান। সময় চলে যায় নাম কেনার, তাই ঝোপ বুঝে কোপ মারো, আবোল তাবোল যে যেখানে পারো—মারো আর মারো। বেপরোয়া যুগ, এখানে কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।

যাকগে এই ইতিহাস বিকৃতকারী ঐতিহাসিকদের কথায় আসছি পরে। এখন ফিরে আসি আমরা হজরত পীর দানশাহ'র সমাধি স্থলে। এই দরগাহে পীরের নির্দ্দিষ্ট সমাধির চিহ্ন যদিও কেউ আজ সঠিকভাবে বলতে

পারছেন না, তবুও সবাই ঐ উঁচু স্থানটিকেই স্থির করে নিয়েছেন। কারণ, প্রাচীনকাল থেকেই ঐ গাছ সমেত উঁচু জায়গাটিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে —করেছেন পূর্ব পুরুষরা।

এখানে আরো একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে পীরের ছোট ভাই শাহ্ আশক হোসেনের সমাধিও দেওয়া হয়েছিল এখানেই। রতুয়া/বাহারাল গ্রামের অনেকেই এই সমাধির চিহ্ন দেখেছেন। তাঁরা বলেন, 'সমাধিটির উপরে একটি ঘন বাঁশঝাড় গজিয়ে উঠেছিল', আজ কিন্তু সেসব কোন চিহ্ন নেই। যাই হোক দুই ভাইএর সমাধি যে এখানেই আছে, এটা নিশ্চিত। কারণ, দানশাহর সমাধি আজকের চিহ্নিত নয়—চিহ্নিত প্রাচীন কাল থেকেই।

এখানে আর একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই সমাধিটি কিন্তু দানশাহর প্রথম সমাধি নয়—এটি হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় সমাধি। খানিক আগে যে আপনার পশ্চিম পাড়ে কালিন্দ্রী নদীর কথা বললাম, এই নদীটি কিন্তু এখনকার স্থানে ছিলনা, ছিল অনেক দূর আরো পশ্চিমে। আমার দাদু মশাই প্রায় শত বছর পূরতি করে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মুখেও শুনেছি এবং আরো অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনে আসছি যে; হজরত দানশাহ'র সমাধি প্রথমে দেওয়া হয়েছিল আরো প্রায় মাইল খানেক পশ্চিমে। অর্থাৎ 'ফকির ত্যাকিয়া' নামক স্থানে (বর্তমান কালুটোলা নামক জায়গায়) বেশ দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছিল সেখানেই সমাধির বয়স। বর্ষাকালে নদী যখন পশ্চিম থেকে কাটতে কাটতে এসে পড়ে সমাধির নিকটবর্তী, তখন এক রাত্রে উল্লিখিত 'হাবেলি' নামক গ্রামে পীর তাঁর ভাই আশক হোসেনকে স্বপ্ন দেন যে—তুমি ঘুমিয়ে আছো ? আমায় নদী কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন দেখেই চমকে উঠেন আশক হোসেন আর সঙ্গে সঙ্গেই জমা করেন কিছু লোক জন এবং তৎক্ষণাৎ কোদাল খুন্তি নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েন সমাধি স্থলে। সেখানে পৌঁছেই সবাই দেখেন যে, সত্যি, নদী একেবারে সমাধির কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে। অতএব শুরু হয়ে যায় সমাধি খননের কাজ। বের হয়ে পড়ে এক কাঠের সিন্দুক এবং সবাই অবাক হন সিন্দুকে পীর দানশাহ'র মরদেহ দেখে। অনেক দিনের দেহ

অথচ তিল মাত্রও দেহের কোন ক্ষতি হয়নি। কোন দুর্গন্ধ নেই বরং এক প্রকার সুগন্ধ বের হচ্ছে দেহ থেকে। সুতরাং সেই সিন্দুক সমেত দেহকে বহন করে আনা হয় আজকের এই উঁচু স্থানটিতে এবং এখানেই দেওয়া হয় তাঁর দ্বিতীয় সমাধি।

আরো জানা যায় যে, হজরত দানশাহ-ই স্বপ্নে এই জায়গাটি চিহ্নিত করে দেন। হয়তো অনেকেই বলবেন, এই সব ঘটনার ইতিহাস পাওয়া যাবে কোথায় ? আসলে এইসব ঘটনার ইতিহাস কোথাও লেখা নেই, পূর্বপুরুষরা সবাই বংশানুক্রমে শুনে আসছেন যা বৃদ্ধদের মুখে আমরাও আজ শুনে আসছি। আর একথাও ঠিক যে তখনকার যুগে এইসব ঘটনাকে কাগজের পৃষ্ঠায় তুলে রাখার জন্য এই এলাকায় তেমন লোকও ছিলেন না। আর তা না হলে আজ আমরা এই রতুয়া/বাহারালের ইতিহাস লেখতে দানশাহ এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিতে পারতাম। এই তো মাস খানেকের কথা। আমি এবং বন্ধু এ, রশিদ কয়েকদিন দানশাহর সমাধির চারপাশ পরিদর্শন করছিলাম। আগেই বলেছি এখানে কোন ভয়ঙ্কর জঙ্গল নেই, নেই কোন ভয়। পরিদর্শন করতে করতে যা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন চোখে পড়ল তা হচ্ছে সামাধিস্থলের গোটা এরিয়ার চারপাশে রয়েছে মাটির ভিতরে সে যুগের গৌড়ীয় ইঁটের প্রাচীর। বর্তমানে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার ফলে মাটির বরাবর প্রাচীরের ভিত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আরো দেখা যাচ্ছে প্রাচীরের এরিয়ার ভিতরে ঘরের ভিতের চিহ্ন। মাটির তলায় রয়েছে ইটের উপর ইট তার উপরে আবার ইট। এসব দেখে মনে হয় দানশাহর সমাধি দেওয়ার অনেক আগেই এখানে কোন রাজবাড়ী বা কোন মন্দির-মসজিদ থাকতে পারে। প্রায় শত বছরের মধ্যে দানশাহর সমাধির চারধারে ইটের প্রাচীর দিয়ে কোন লোক ঘিরিয়ে ছিলেন কিনা, এই কথা আজ অনেক বৃদ্ধদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন—এমন কথা জীবনে কেউ শোনেন নি। তাই দেখে শুনে মনে হয় এটা প্রায় হাজার বছর আগেকার সভ্যতা আজ উঁকি মেরে দেখা দিচ্ছে জন সমাজে - যা এতদিন ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেই প্রাচীন সভ্যতা ছিল লুকিয়ে

এখন সমাধিস্থল পরিষ্কারের ফলে আজ আমাদের চোখে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠেছে সেই প্রাচীন সভ্যতা। মনে হয় আজ এই এলাকা অনেক অনেক অতীতের কথা, অতীতের ইতিহাস বলতে চায় মুখে মুখে।

এক কালে এই সমাধির আশে পাশে বিরাট এক বাঘকে অনেকেই বসে থাকতে দেখেছেন, যে বাঘ কোন দিন কারোরই ক্ষতি করে নি। বর্তমানে রাত্রেও থাকা যায়। এই তো কয়েকদিন আগে রতুয়ার আব্দুল গোফ্‌ফার (হামেদিয়া—প্রেস মালিক) ও মাদিয়া/মালদহ নিবাসী মহঃ কামরুল হুদা সাহেব, দানশাহর সমাধি স্থল পরিদর্শনে গিয়ে দেখে আসেন, বিকালে দুইজন মহিলা সমাধির পাশে বসে শান্ত মনে দিব্যি কোরাণ তেলাওত (কোরাণ পাঠ) করছেন। পাশে রয়েছে বেশ কিছু চিনির শিরণী, আগড়বাতির (ধুপকাঠির) গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে সমাধি স্থান।

এই স্থান থেকে,আফিলুদ্দিনের পাওয়া নক্সা করা ইঁট ও তার গায়ে সে যুগের লেখনী এবং আরো আমারই পাওয়া এক ইঁটের গায়ে নক্সা প্রমাণ করে সে যুগের মানব সভ্যতার নিদর্শন। আরো শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেছে সমাধিস্থানের কুপ খননের সময়। এই কুপ খনন করার সময় খননকারীরা প্রায় ১২/১৩ হাত মাটির নীচে এক পাত্রে পেয়েছিলেন বেশ কিছু মূল্যবান পাথরযুক্ত সোনার হার। হার খানার ওজন কত ছিল তা বলা শক্ত, তবে শোনা গেছে খননের সময় কোদালের আঘাতে পোড়া মাটির পাত্রটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে হারখানা টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং পরে খননকারীরা সবাই ভাগ বন্টন করে নেন—কেউবা শুধু পাথরগুলো নিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেন। হারের টুকরো সোনাগুলো আজ খননকারীদের কাছে না থাকলেও সেই প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবান পাথরগুলো আজও হয়তো অনেকের বাক্সে মাথা গুঁজে বলে চলেছে অতীত দিনের মানব সভ্যতার ইতিহাস।

পীর পরিচয়

পীর দানশাহ এসেছিলেন পশ্চিম দেশ থেকে। তবে পশ্চিমের কোন্ স্থান থেকে কত সালে এসেছিলেন একথা আজো কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। তবে কারো কারো মতে নবাব সিরাজদৌলার আগেই এসেছিলেন। এসেছিলেন একা নয়, সাথে এনেছিলেন বেশ কয়েক সম্প্রদায়কে। যেমন—নাপিত, ধোপা, দর্জি, মুচি, জেলে প্রভৃতি।

তিনি এসেছিলেন মালদহ জেলার রতুয়া থানার সাহাপুর—বাহারাল নামক স্থানে। বসবাস করেছিলেন এই সাহাপুর গ্রামের অন্তর্গত 'হাবেলি' নামক জায়গায়। তাঁর দানশাহ নাম থেকেই নাম হয়েছিল 'শা'হাপুর, পরে হয়ে যায় 'সা'হাপুর। আর 'হাবেলি' নামটিও তাঁরই আমলে হয়েছিল। কারণ, 'হাবেলি' শব্দের অর্থই হচ্ছে 'বাড়ী'। যেহেতু পীরের বাড়ী এখানেই প্রথমে গড়ে উঠেছিল তাই জায়গাটির নাম হয়েছিল হাবেলি। আর এই হাবেলিতেই রয়েছে সে যুগের দু'খানা প্রাচীন পুকুর। বর্তমানে একটির নাম 'খানগাহ পুকুর' এবং অপরটির নাম 'লাউয়াকা পোখ্যার' (অর্থাৎ নাপিতদের পুকুর)। প্রথম পুকুরটি রয়েছে দানশাহর বসত ভিটার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে। আসলে এই পুকুরটির নাম 'খানগাহ্ পুকুর' ছিলনা, ছিল 'খানকাহ্' অর্থাৎ এই পুকুরটির পূর্ব পাড়েই দানশাহ্ বসত ভিটা ও চিল্লাখানা (তপস্যা করার ও পীরের সাথে সাধারণের যোগাযোগের স্থান) গড়ে ছিলেন তাই ওটার নাম হয়েছিল 'খানকাহ্'। পরে এই খানকাহ্ লোক মুখে হয়ে যায় খানগাহ্. আর দ্বিতীয় পুকুরটি মনে হয় নাপিতদের ব্যবহারের জন্য ছিল। কারণ এই পুকুরটির উত্তর পাড়ে নাপিতদের বসত বাটী গড়ে উঠেছিল। এই পুকুরের আরও একটি নাম শোনা যায় 'স্যানেকা গাড়হা' অর্থাৎ এই পুকুরটির পশিচম পাড়ে একটি বিরাট আমগাছ ছিল যার আমের মধ্যে প্রচুর জটা-সনের মত সরু সরু সুতোর ন্যায়—তাই তাকে এখনো অনেকে 'স্যানেকা গাড়হা' বলে থাকেন।

যাই হোক পীর সাহেব এই হাবেলিতেই বসবাস করেন। আজো যেখানে তাঁর বসতভিটার সেই প্রাচীন চিহ্ন রয়েছে; সেখানে দেখতে পাবেন মাটির ঢিবি। যে ঢিবির অর্দ্ধেক দক্ষিণাংশে বর্তমানে গড়ে উঠেছে ফিডিং সেণ্টার, পশ্চিমাংশে রয়ে গেছে ফাঁকা উঁচুর অর্দ্ধেক ঢিবি। কিন্তু বাহারালে এত জায়গা থাকা সত্ত্বেও কেন যে পীরের পবিত্র প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বসতভিটার অর্দ্ধেকাংশের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে এই ফিডিং সেণ্টার গড়ে উঠল কিছুই বুঝতে পারছি না।
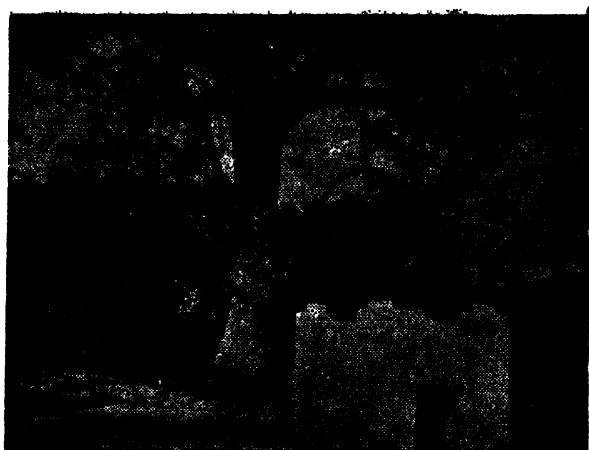
দানশাহর বসতভিটা

যাই হোক বলছিলাম ঢিবির কথা। ঢিবিটা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন তার সাথে যুক্ত রয়েছে সে যুগের ছোট বড় ইঁটের টুকরো। আর এরই মাঝখানে মাথা তুলে আজো দাঁড়িয়ে আছে সেই যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নিমগাছ, যার দেহে নাকি দু'দুবার সুগন্ধি কাঠ ফুটেছিল যাকে লোকে চন্দন রূপে ব্যবহার করতো। আজো এই নিমগাছের গোড়াতেই পড়ে রয়েছে সেই যুগের দু'খানা হাত তিনেকের কালো পাথর।

এই পাথরটি আগে একটিই ছিল কিন্তু কেমন করে যে দু'ভাগে বিভক্ত হল তা আজ আর কেউ বলতে পারছেন না। শোনা যায় এই পাথরে

বসে হজরত পীর দানশাহ ওজু করতেন আর যখন তিনি হুকুম করতেন, পাথর তখনই তাঁকে পিঠে করে নিয়ে যেত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে।
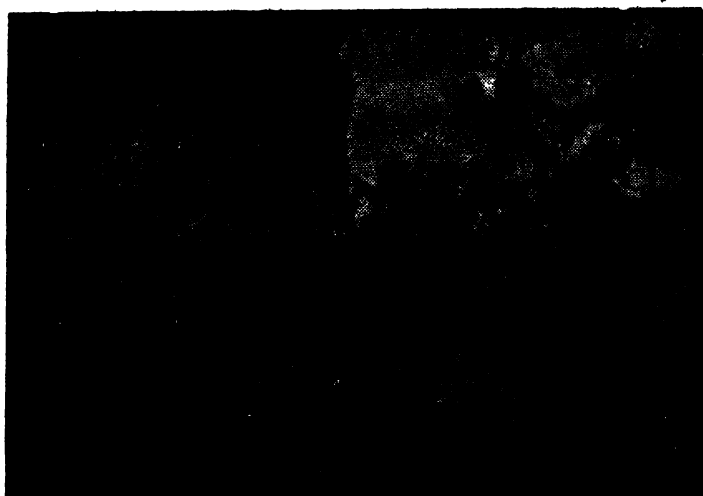
ভিটার নিমগাছ ও প্রাচীন প্রস্তর খণ্ড

এখানে আরো কিছু জানিয়ে রাখা ভাল যে, দানশাহর আমলে আজকের সাহাপুর মৌজার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে হিন্দুদের এক 'জামাহির-গীর গোস্বামী' নামে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। পরে লোকমুখে তিনি গোসাঁইজি বলে খ্যাত হন। আজও তাঁর নাম থেকেই জায়গাটির নাম হয়ে আছে 'গোসাঁইকা বাড়ী' অর্থাৎ গোসাঁইজির ভিটা। গোসাঁইজির চার ছেলে (১) রাজা গোসাঁই (২) মহারাজা গোসাঁই (৩) দ্বারক গোসাঁই ৪) রঘুনন্দন গোসাঁই। বর্তমানে গোসাঁইজীর কোন বংশ প্রদীপ নেই। বড় ছেলে 'রাজা' বিয়ে করেছিলেন. মেজো করেন নি, সেজো মৃগী রোগে জলে ডুবে মারা যান। আর রঘুনন্দনও শোনা যায় বিয়ে করেন নি। যাই হোক সিদ্ধ পুরুষ জামাহিরগীর গোস্বামী তাঁর বংশ গৌরবের কোন বংশ প্রদীপ না রেখে গেলেও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির ঘটনা আজো অনেক হিন্দু-মুসলিম বৃদ্ধদের মুখে শুনে আসছি। হজরত

দানশাহর পাথর যেমন পিঠে করে দানশাহকে নিয়ে যেত তেমনি গোসাঁই-জির বাহন ছিল বাঘ।
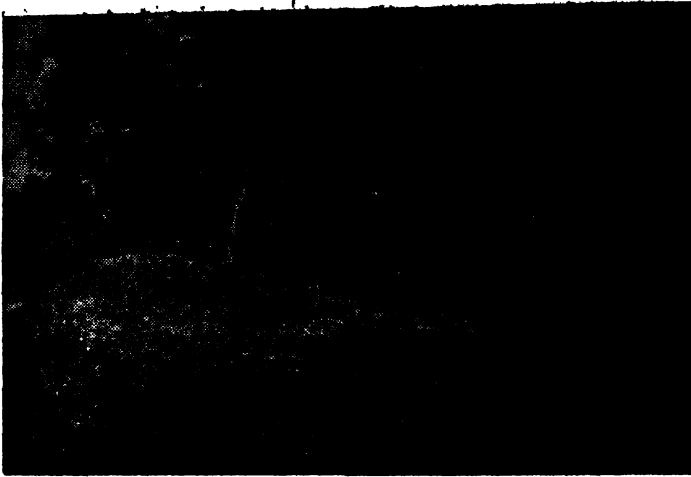
জামাহিরগীর গোস্বামীর সমাধিস্থান

বর্তমান আটগামা গ্রামের শেষ প্রান্তে পশ্চিম ও উত্তর কোণে এই গোসাঁইজির সমাধি এখনো রয়েছে। বেশ উঁচু ঢিবি যার উপর তিনখানা তালগাছ ছিল, বর্তমানে দু'খানা গাছ কাটা হয়েছে; একটি এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় পূর্বে এই স্থানে 'মঠ' ছিল, তাই 'মঠ' থেকেই ঐ জায়গাটির নাম আজও লোক মুখে 'ম্যাঠ্‌কা বাড়ী' হয়ে আছে। এই গোসাঁইজির সমাধিস্থানটা কয়েক বছর আগে দু'একজন মুসলমান নিজের জমির মধ্যে দখল করে নেন। পরে কয়েকজন হিন্দু মোকর্দ্দমা করে পুনরুদ্ধার করেন। এখনো ওখানে একজন ব্রাহ্মণ (সেবাইত) সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে আসেন।

যাকগে বলছিলাম দানশাহের বসতভিটার কথা। যেখানে নিমগাছটির এবং কালো পাথরটির বর্ণনা দিলাম, সেই নিমগাছের নীচে এবং পাথরের পাশেই গড়ে উঠেছে ইমামবাড়া (অর্থাৎ ইট কিংবা বাঁশের বাতা দিয়ে মহরমের সময় খেলা ধূলার যে পবিত্র স্থানটি ঘেরা হয়)। এই ইমাম-

বাড়াও অনেক দিনের। আমরা প্রতি বছর মহররমের সময় এখানে নানা ধরণের খেলা ধূলা করে থাকি। মারশিয়া-মাতম প্রভৃতি অত্যন্ত শোকের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। মহররমের নবমীর প্রভাত থেকে দশমী পর্যন্ত এখানেও (পীরের দরগাহে) অনেকেই মানত করা 'খিচড়া' (আতপ চাউল, ডাল, ঘি, বিভিন্ন মশলা দিয়ে রান্না) মুরগার মাংস শোধ দিতে আসে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত খিচড়া মাংস জমা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই গরীব দুঃখী এমন কি ধনীরাও সে খিচড়া মাংসের ভাগ পান। মহরমের দশমির দিন বৈকালে সাহাপুরের সমস্ত তাজিয়া/নিশান প্রথমে এখানে এসে মিছিলের সাথে জড়ো হয় এবং নানা খেলা ধূলার পর বিরাট এক শোক মিছিলের সাথে কাল্পনিক কারবালাভিমুখে রওয়ানা দেওয়া হয়ে থাকে। আগে অবশ্য সাহাপুর বাহারালের সমস্ত তাজিয়া/নিশান নিজ নিজ মিছিলসহ সাহাপুর জমিদারের দুয়ারে গিয়ে হাজির হতো। সমস্ত দলের নানা খেলা ধূলা হত, হত মারশিয়া-মাতম প্রভৃতি। আবার সব শেষে মিছিলের সমস্ত লোককে পেট ভরে খিচড়া খাওয়ানো হত। কিন্তু আজ জমিদারের দুয়ারে তাজিয়া/নিশান যায় না, ফলে এখন এই পীরের বসতভিটার মাটি স্পর্শ করেই সবাই মিছিলসহ চলে যান কারবালাভিমুখে।

পীরের বংশধর-এর পরিচয়

আগেই বলেছি পীর একা আসেন নি, এসেছিলেন নাপিত, ধোপা, দর্জি, জেলে, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়কে সাথে করে। আর যে কথাটি বলা হয়নি তা হচ্ছে, পীরের সাথেই এসেছিলেন তাঁর ছোট ভাই শাহ আশক হোসেন যাঁকে ছোট হজরত বলা হত। শোনা যায় তাঁর আশীর্বাদে কোন ফল হত না কিন্তু অভিশাপ সঙ্গে সঙ্গেই ফলে যেত।

হজরত দানশাহ বিয়ে করেন নি। তিনি ছিলেন নিঙ্গোটবান্দ (ব্রহ্মচারী) আল্লার ভক্ত বান্দা। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই আশক হোসেনের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম পক্ষের নাম 'পাগলি বিবি', দ্বিতীয় পক্ষের নাম জানা নেই। প্রথম পক্ষ অর্থাৎ পাগলি বিবির গর্ভে তিন সন্তান। পুত্র—শাহমুগা ও শাহমতি এবং কন্যা 'আমুলন' যাঁর প্রচলিত নাম 'মুলন খাতুন'।

শোনা যায় একদা আশক হোসেনের দুই পুত্র শাহমুগা ও শাহমতি বাল্যকালে দুই ভায়ে মিলিত হয়ে একটি শশার বীজ বপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বীজ থেকে গাছ বের হয়ে ফুলে ফলে পরিণত হয়। দু'ভায়ের কীর্তির এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে পিতা আশক হোসেন আক্ষেপ ভরে বলতে থাকেন—এই বয়সে তোরা যদি এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারিস তাহলে তোদের তো এখন বাঁকি জীবন পড়েই আছে। শোনা যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দু'ভাই-ই মারা যান। ফলে আশক হোসেনের বেঁচে থাকেন একমাত্র কন্যা মুলন খাতুন। মুলন খাতুন ছিলেন পরমা সুন্দরী। একদিন সাহাপুর গ্রামের তদানিন্তন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধুমন খাঁ সাহেব যাচ্ছিলেন হাতীতে চড়ে, মুগ্ধ হন মুলনের রূপ দেখে। তাঁর প্রথম পত্নী থাকা সত্বেও বিয়ের প্রস্তাব রাখেন শাহ আশক হোসেনের কাছে, ফলে মুলন খাতুনের মহাধুমে বিয়ে হয়ে যায় উক্ত ধুমন খাঁ-এর সাথে।

যাই হোক এই মুলন বিবির গর্ভে দুই পুত্র—মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ ও মোহাম্মদ ইউসুফ খাঁ এবং এক কন্যা বিবি রৌণাক স্বামী—আমীর হামজা খাঁ। আইয়ুব খাঁর দুই পুত্র (১) মোহাঃ মজিবুর রহমান খা (২) মোহাঃ

মজিবুর রহমান খাঁ। (যিনি সম্প্রতিকালে পরলোকগমন করেছেন)। মজিবুর রহমান খাঁয়ের পুত্র সফিউর রহমান খাঁ, ওয়াহেদুর খাঁ, সাহেদুর রহমান খাঁ, হবিবুর রহমান খাঁ এবং বাবু খাঁ, যার বর্তমানে বয়স ৭ বছর।

আর মজিবুর রহমান খাঁয়ের পুত্র—মোহাঃ আবিদুর রহমান খাঁ, মোহাঃ হাসিউর রহমান খাঁ, খুরশিদুর রহমান খাঁ (বয়স পনেরো) এবং কন্যা মোসাম্মৎ তাহেজিবা খাতুন।

এখন বাঁকি থাকেন ইউসুফ খাঁর বংশধররা। ইউসুফ খাঁর দুই পুত্র হাজী মোহাম্মদ আলী হায়দর খাঁ সাহেব (যাঁর বর্তমান বয়স ৮৪ বছর)। এবং দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আলমগীর খাঁ।

হাজী মোহাম্মদ আলী হায়দর খাঁয়ের পুত্র—মোহাঃ সালিম আক্তার খাঁ, সালিম আনোয়ার আলী খাঁ, হাবিব আক্তার খাঁ, সাইম আসগর আলী খাঁ (যার বর্তমান বয়স ছয় বছর) এবং কন্যা রৌশাক আফরোজা খাতুন। এই উল্লিখিত ব্যক্তিগণই হচ্ছেন হজরত পীর দানশাহর বংশ গৌরব এবং 'সাহাপুর' জমিদারীর প্রাক্তন জমিদার। এঁরা সবাই বংশানুক্রমে এখনো বসবাস করে আসছেন সাহাপুর গ্রামেই। এই হল পীরের মোটামুটি বংশধর-এর পরিচয়।

দানশাহর বংশধরের ব্যাপারে বর্তমান সাহাপুর—ছাবেলি এবং আরো অন্যান্য জায়গায় বসবাসকারী নিম্ন-মধ্যবিত্ত এক শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষদের দাবী যে, তাঁরাও নাকি দানশাহর বংশধর। তাঁদের বক্তব্য—এঁরা শাহ্ আশক হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত (বংশানুক্রমে) বংশধরের দাবী করে আসছেন। কিন্তু তাঁদের এই দাবী অমূলক। কারণ, আশক হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের কোন সন্তান ছিলনা এমন কি দ্বিতীয় পক্ষ স্ত্রীর নামটিই বা কি ছিল তাও সকলের অজানা। আর এ কথাও ঠিক যে, তাঁরা যদি পীরের বংশধর হতেন তাহলে আশক হোসেনের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যা মুলন খাতুন সাহাপুর জমিদারীর জমি-জমার মালিক হলেন কিন্তু আশক হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানরা উক্ত জমিদারীর অংশ পেলেন না কেন ? যাই হোক এই ব্যাপারে অনেক তদন্ত করেও এদের এই দাবীর সমর্থনে এখন পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাইনি।

সাহাপুর জমিদারী

হজরত দানশাহ ছিলেন নবাব সিরাজদৌলার পীর। আর সিরাজ ছিলেন পীরের প্রিয় শিষ্য। পীরের বহু আধ্যাত্মিক শক্তি সিরাজকে মুগ্ধ করে, যার ফলে 'সাহাপুর' সমস্ত জমিদারী তাছাড়া প্রায় সাত আট শত বিঘা মিলিক (নিষ্কর) সম্পত্তি সিরাজ, দানশাহকে দান করেন। শুধু তাই-ই নয় পীরের এখানে শত শত শিষ্য আসবেন, শত শত আরও অন্যান্য মানুষ আসবেন যোগাযোগের জন্য—এত এত মানুষের খাওয়া দাওয়া, তরী-তরকারীর অভাব হবে, তাই বর্তমান রতুয়ার প্রায় কাছ থেকে আড়াইডাঙ্গা গোবর্জনা ঘাট পর্য্যন্ত এই কালিন্দ্রী নদীর জলকরটিও হজরত দানশাহকে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নবাব সিরাজদৌলা দান করেন। যার দানপত্র সিরাজের হাতের স্বাক্ষরিত ফার্সী ভাষার দলিলটি সাহাপুরে খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে। যে দলিল অতি মুল্যবান বেশ বড় ধরণের কাগজে ফার্সী ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত এখানকার অনেকেই কিছুদিন আগেও স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন হাজী সেখ আব্দুল করিম, যিনি মাস দু'এক আগে ৯৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। দলিলখানা আরো দেখেছেন হাফেজ সেখ আব্দুল আলিম, সেখ ইব্রাহিম, সেখ দেরাসতুল্লা প্রভৃতি। দলিলখানা ছিল হাবেলি গ্রামের মীর হাব্বুর কাছে। তাঁর বাড়ীর সমস্ত কাগজ-পত্র খুঁজেও দলিলটির কোন হদিস পাওয়া গেলনা। তিনি বলেন, "তহমিনা বেওয়া দলিলখানা নিয়ে কাকে কাকে দেখিয়েছিল, কোথায় যে রাখল কিছু বলতে পারছিনা।" আজ তহমিনা বেঁচে নেই, নইলে অতি সহজেই দলিলখানা বের করা যেত। তাই দলিলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দেশবাসীর কাছে দলিলটির ফটোগ্রাফি না দিতে পারায় অত্যন্ত দুঃখিত।

যাই হোক এখন আসা যাক উল্লিখিত জলকরের ব্যাপারে। এই জলকর নিয়েও এক রহস্যজনক ঘটনা জানা গেছে। সিরাজ যখন জলকরটি হজরত দানশাহকে লেখেন—তখন কতটুকু জলকর দেবেন এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ

ভাবাগুণা চলতে থাকে। পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, রতুয়ার কাছ থেকে একখানা মাটির হাঁড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিতে হবে কালিন্দ্রীর স্রোতে। প্রদীপ যেখানে নিভে যাবে সেই পর্য্যন্ত এবং এর যেখানে যেখানে যেসব কোল-কান্দর (নদীর স্রোতের মুখে কোল হয়ে বিলের ন্যায়) মিশে আছে কালিন্দ্রীর সাথে, এ সমস্তই হজরত পীর দানশাহ পাবেন। শোনা যায় হাঁড়িটি নদীর প্রায় ৩০ কিলোমিটার (বর্তমান মাপ) অতিক্রম করে আড়াইডাঙ্গা গোবর্দ্ধনার কাছে প্রদীপ নিভে যায় এবং সেই পর্য্যন্ত জলকর, দানশাহকে দান করা হয়।

আরো জানা গেছে যে, প্রায় ৪৫/৪৬ বছর পূর্বে এই জলকরের 'বিশনপুর কোল' (লক্ষীকোল) নিয়ে চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুরের সাথে সাহাপুরের জমিদারদের এক মোকর্দ্দমা হয়। রাজা রায় বাহাদুরের আপত্তি যে উক্ত বিশনপুর কোল নাকি জলকরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই মোকর্দ্দমায় সাহাপুরের জমিদাররা বিব্রত হয়ে পড়লে, বর্তমান হাজী আলী হায়দার খাঁ সাহেবের প্রথমা স্ত্রী বিবি খুরশেদী খাতুনকে হজরত দানশাহ স্বপ্ন দেন যে, জলকরের ব্যাপারে তোমরা চিন্তা করনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বেশ কিছুদিন মোকর্দ্দমা চলার পর জমিদারেরা কিছু পুরনো কাগজ-পত্র নক্সা কোর্টে দাখিল করে উক্ত মোকর্দ্দমা জিতে নেন। 24 July 1935 এই জলকরের নক্সাটি মালদহ সাব জজ কোর্টে পেশ করা হয় এবং তার অপর পৃষ্ঠায় Sub Judges মালদহ কোর্টের 24 July 1935-এর শীল মোহর রয়েছে। যার রায়ের সাথে এ্যাটাচড্ কাগজে লেখা আছে Final Comparative Map of Mouja Joginigaon R. S No. 88, JL No 334, Thana Ratua, River. Kalindri, Parganah, Scale 4" = 1 Mile. শীলমোহর

Sub Judge's court Malda 20 Nov. 1936

আজ এই ইতিহাস রচনার জন্য জমিদার বাড়ীতে পুরনো কাগজ-পত্র খুঁজতে গেলে, হজরত দানশাহর বংশ গৌরব হাজী মোহাঃ আলী হায়দর খাঁ

সাহেব, মোহাঃ আবিদুর রহমান খাঁ, মোহঃ হাসিবুর রহমান খাঁ কাগজ-পত্র দেখালেন। শুধু তাই-ই নয় উক্ত জলকরটির যে নক্সাটি বের করে দেখালেন—তা দেখে অবাক হলাম। নক্সাটি কাগজের উপরে নয়, কাপড়ের উপর মোম তো নয়ই, আমার মনে হয় কোন প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ দিয়ে সুন্দর পালিশ করা। যার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২ ফুট ৪ ইঞ্চি। জলকরের এই নক্সাটির উপরে লেখা আছে—

"১ নং নক্সা কোম্পাস মহাল জলকর লক্ষ্মীকোল পরগণে মাকরাইন একবরপুর মহাল ১২ থাজে অস্তি খাস মোতানকে কালেক্টার জেলা মালদহ কৃত শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস আমিন ১৮৬৪ ইংরাজী সাল ৩১ ডিসেম্বর মোতাবেক বাংলা ১২৭১, ১৮ই পৌষ।"

জলকরের নক্সা

কাগজ-পত্র ঘাটতে গিয়ে আরো দেখতে পেলাম উক্ত জমিদারী-মিলিক সম্পত্তির ১২৬৩ সালের এক আশ্চর্য্য দলিল—যার বয়স আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর হবে। আর এই দলিল পাঠ করেই জানা গেল যে, আজকের এই 'রতুয়া' থানা ১২৫ বছর আগে 'রতুয়া' থানা নামে পরিচিত ছিল না. ছিল থানা 'গোড় গারিবা'। দুই টাকার স্ট্যাম্পের উপরে কাল কচ্‌কচে কালিতে

উর্দু-ফার্সীতে লেখা এই দলিল। হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় না যে এটা হাতের লেখা, আজকের আধুনিক টাইপকেও হার মানাবে অনেকাংশে। আর আনন্দের কথা যে. এই দলিলটির নিং আমাদেরই সাহাপুরের এক ব্যক্তি যাঁর নাম সেখ বদিরুদ্দিন আহ্মেদ। শুধু তাই-ই নয়. যিনি দলিল দাত্রী তাঁর নাম বিবি রহিসন্নেশা-স্বামী সৈয়দ শাহ্ খুর্রম আলী. সাং সাহাপুর; মালদহ। দলিলের উপর এই বিবি রহিসন্নেশার উর্দু ভাষায় স্বাক্ষর মুহূর্তেই মনকে আকর্ষণ করে। আরো আকর্ষণ করে দলিলে অনেক স্বাক্ষীদের উর্দু. নাগরী, হিন্দী এবং বাংলা ভাষার স্বাক্ষরগুলো যার ফটোগ্রাফী দেওয়া হল।

আজ পীর দানশাহ নন, আছে তাঁর সমাধির কাছাকাছি কালিন্দ্রী নদীর সেই জলকরখানা। আজও সরকার থেকে জলকরখানি যাঁরা বন্দোবস্ত করে নেন, তাঁরা প্রতি বছর জলকরে মাছ ধরার আগেই পীরের দরগাহে শিরণী স্বরূপ খাসি পোলাও রান্না করে কিংবা মণ্ডা মিঠাই পীরের মজরানা দিয়ে গরীব দুঃখী এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সবাই খেয়ে থাকেন। এমনি শিরণী আমরাও গিয়ে খেয়ে এসেছি পীরের দরগাহে অনেকবার।
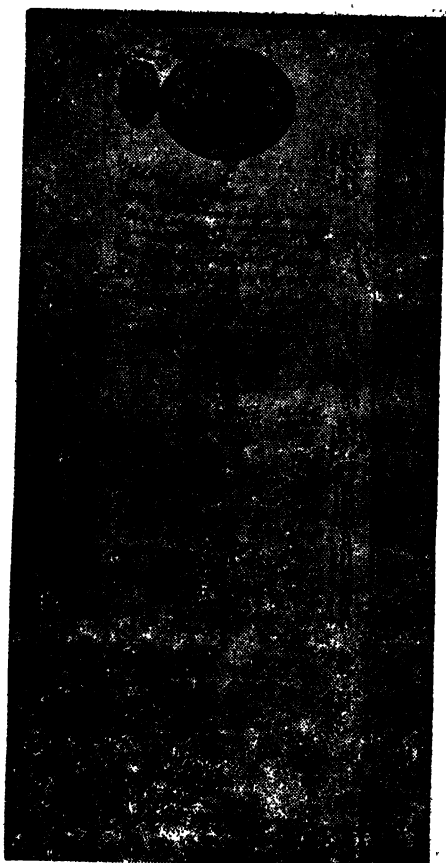
পাঠানদের আগমন ও জমিদারী লাভ

জমিদারদের পূর্বপুরুষ 'পোর্দাল খাঁ' কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে প্রথমে এসেছিলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে—পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা, পিণ্ডিভিটিয়ার অন্তর্গত 'মেওয়াত' নামক জায়গায়। সেখানে কিছুদিন বসবাস করার পর কোন কারণবশতঃ তাঁরা মেওয়াত ছেড়ে চলে আসেন বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার বাহাদুরগঞ্জ এলাকায়। কিন্তু সেখানেও বসবাসের তেমন সুবিধাজনক স্থান না পেয়ে তাঁরা চলে আসেন আজকের মালদহ জেলার মাণিকচক থানার অন্তর্গত 'তুরুকডিহা' নামক স্থানে। কিন্তু ভাগ্যে তাঁদের উক্ত 'তুরুকডিহা'ও বেশিদিন জুটলো না। দেখা দিল অত্যন্ত জলাভাব—দেখা দিল রোগ মহামারী, ফলে সবাই তুরুকডিহা ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন আজকের এই নুরপুরে।

এই 'নুরপুর' নামেরও সার্থকতা খুঁজে পাওয়া গেছে। শোনা যায় প্রাচীন কালে কোথা থেকে দু'ভাই নিঙ্গোটবান্দ (ব্রহ্মচারী) আল্লার ভক্ত এখানে এসে উপস্থিত হন এবং দীর্ঘদিন বসবাস করেন। উক্ত দু'ভাই-এর মধ্যে বড় ভাই-এর নাম ছিল নুর মোহাম্মদ। এই 'নুর' মোহাম্মদ থেকেই 'নুরপুর' নাম হয়েছিল। এখনো নুরপুরে 'আখারা' নামক জায়গায় দু'ভাই-এর সমাধি রয়েছে। সমাধির পাশেই ছিল সে যুগের বিরাট এক নিমগাছ। একদা সেই গাছ নুরপুরের কিছু লোক কাটতে গেলে, কিছু লোক বাধা দেওয়া সত্ত্বেও গাছটি গোড়া থেকে কাটা হয়। কিন্তু পরে আবার সেই কাটা গোড়া থেকে গজিয়ে উঠে প্রচুর ডাল-পালা এবং ধীরে ধীরে আকার ধারণ করে বিরাট এক গাছের। এখনো সেই নিমগাছ বিরাট ঝাঁকরা হয়ে তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এখনো প্রতি বৃহস্পতিবারে নুরপুর ও তার আশ পাশের লোকেরা উক্ত সমাধির কাছে এসে তাঁদের মানত করা শিরণী পরিশোধ করে থাকেন।

যাকগে, বলছিলাম পোর্দাল খাঁ-এর কথা। শোনা যায় পোর্দাল

খাঁ-এর সাথে এসেছিলেন আরো কয়েক সম্প্রদায়। যেমন মুসলমান ধোপা, হিন্দু নাপিত, ব্রাহ্মণ, ধুনে (নাদাপ), মোমিন (তন্তুবায়), কুজরা (সব্জি) প্রভৃতি—যাঁদের বংশানুক্রমে বংশধররা আজো বসবাস করে চলেছেন নুরপুর এলাকায়।

পাঠানদের মধ্যে স্যুরি, লোহানি অর্থাৎ লোদী, ইউসুফজায়ী প্রভৃতি কয়েকটি ভাগ আছে। পোর্দাল খান ছিলেন উক্ত 'ইউসুফজায়ী' বংশীয়।

পোর্দাল খানের এক পুত্র—সর্দার খান।

সর্দার খানের দুই পুত্র—উজির খান ও লাখ্মীর খান। উজির খানের সাত পুত্র (১) সেরাজ খাম (২) মিঞে খান (৩) মেহেরাব খান (৪) ধূমন খান (৫) সাহেরিয়ার খান (৬) উমার ইয়ার খান (৭) মাগরাবি খান।

এখন বাঁকি থাকেন লাখ্মীর খান। কিন্তু লাখমীর খানের কোন সন্তান ছিল না।

উক্ত সেরাজ খান-এর এক পুত্র—গুজার খান। এবং গুজার খান-এর দুই পুত্র—আব্দুর রহমান খান ও আসতুর রহমান খান।

আব্দুর রহমানের দুই স্ত্রী। ১ম পক্ষ বিবি সখিনা খাতুন এবং ২য় পক্ষ-বিবি নুরুন্নেশা খাতুন।

আব্দুর রহমানের ১ম পক্ষ বিবি সখিনার গর্ভে জন্ম নেন মোহাঃ আজিজুর রহমান খান।

আজিজুর রহমানের তিন পুত্র, মোহাঃ মাহ্ফুজুর রহমান খাম। মোহাঃ আতাউর রহমান খান ও মোহাঃ খলিলুর রহমান খান।

গুজার খান-এর কনিষ্ঠ পুত্র আসতুর রহমানের কোন পুত্র ছিল না। ছিল একমাত্র কন্যা বিবি ওয়াজেদা খাতুন। এই গেল সেরাজ খান বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

এখন আসা যাক উজির খানের ৪র্থ পুত্র ধূমন খান এর বংশ পরিচয়ে। আগেই বলেছি ধূমন খান-এর দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম পক্ষের সন্তান—বাবর খাঁ, জামসের খাঁ, মাগরাবি খাঁ ও রাহাত খাঁ। এবং দ্বিতীয় পক্ষ মুলন খাতুমের গর্ভ সন্তানদের বংশ পরিচয়, পীর দানশাহর বংশধর-এর অধ্যায়ে আগেই জানিয়েছি।

এবারে আসা যাক উজির খাঁ-এর ৫ম পুত্র সাহেরিয়ার খাঁ-এর সন্তান-দের ব্যাপারে। সাহেরিয়ার খাঁ-এর দুই পুত্র (১) জাঁহাদার খান (২) মেহেরিয়ার খান।

জাঁহাদাদের এক কন্যা বিবি সখিনা খাতুন। মেহেরিয়ার খানের দুই পুত্র (১) মোহাম্মাদ ইয়ার খান (২) হাসেন ইয়ার খান।

মোহাঃ ইয়ার খানের পুত্র— ফাজাল আহাম্মদ খান। ফাজাল খান-এর পুত্র নেয়াজ আহাম্মাদ খান, এহেজাজ আহাম্মদ খান, মমতাজ আহাম্মদ খান, ফাইয়াজ আহাম্মদ খান প্রভৃতি।

হাসেন ইয়ার খানের একমাত্র পুত্র—মহসেন ইয়ার খান।

এখন আসা যাক উল্লিখিত উজির খানের সাত পুত্রের মধ্যে ষষ্ঠ সন্তান উমার ইয়ার খানের সন্তানদের বংশ তালিকায়।

উমর ইয়ার খানের এক পুত্র—এব্রাহিম খান। এব্রাহিম খান-এর চার পুত্র (১) আব্দুল লতিফ খান (২) আব্দুস সাত্তার খান (৩) হাজী মোহাঃ জাহুর খান (৪) মোহাঃ তারিফ খান।

আব্দুল লতিফ খান-এর দুই স্ত্রী—১ম পক্ষের সন্তান—আবুল মাজদ মোহাঃ রশিদ খান, আবুল আশাদ আব্দুর রশিদ খান, আবুল ফারদ মোহাঃ ফরিদ খান এবং দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান—সামসাদ খান।

নুরপুরে আরো অন্যান্য জমিদারদের বংশানুক্রমে বংশধররা রয়েছেন। সকলের নাম ও পরিচয় টেনে আনা অসম্ভব। তাই এখানেই এদিককার কলম ক্ষান্ত করে আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ও পরিচয়ের সাথে আপনা-দের পরিচয় করাই।

আগেই বলেছি পোর্দাল খান এসেছিলেন তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে সাথে করে। পোর্দাল খান বসবাস করেন নুরপুরে আর তাঁর আত্মীয়েরা কেউবা আরাপুর কতোয়ালী কেউবা আবার অন্য কোথাও বসবাস করেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সকলের নাম আজ না পাওয়া গেলেও যে দুই-ভায়ের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন—(১) মোর্তুজা খান (২) মোস্তাফা খান।

মোর্তুজা খান-এর পুত্র— এরতেজা খান। মোস্তাফা খান-এর কোন পুত্র

ছিলনা, ছিল এক কন্যা; যাঁর নাম জানা নেই।

এরতেজা খান-এর পুত্র—আরজুমান খান। আরজুমান খান-এর দুই পুত্র (১) সনামধন্য পাণ্ডুয়া, আদিনা মসজিদের উদ্ধারকর্তা—আবুল হায়াত খান চৌধুরী (২) মাহবুব আহাম্মদ খান চৌধুরী। এবং দুই কন্যা—(১) বিবি জমিলা খাতুন (২) বিবি সামশুন্নেসা খাতুন, যাঁর বিয়ে হয় নুরপুর গ্রামে মোহাঃ আজিজুর রহমান খান-এর সাথে।

এবারে আসা যাক মহামান্য আবুল হায়াত খান চৌধুরী সাহেবের বংশধর-এর পরিচয়ে।

আবুল হায়াত খান চৌধুরী সাহেবের চার পুত্র এবং চার কন্যা। যথাক্রমে পুত্রদের নাম (১) সনামধন্য এ, বি, এ, গণি খান চৌধুরী (বর্তমান ভারতের শক্তিমন্ত্রী) (২) আবু নাশার খান চৌধুরী (৩) আবুল হাসেম খান চৌধুরী (৪) সেলিম খান চৌধুরী।

এই হল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আগত নুরপুর, বাহারাল—সাহাপুর প্রভৃতি জমিদারদের পূর্বপুরুষ পোর্দাল খান ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের বংশানু ক্রমে বংশধর-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। কিন্তু কথা হচ্ছে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরাই কেমন করে বিরাট জমিদারীর মালিকানা পেলেন, এখন আসা যাক সেই ব্যাপারে।

আগেই বলেছি জমিদারদের পূর্বপুরুষ পোর্দাল খানের এক পুত্র—সর্দার খান। এবং সর্দার খানের দুই পুত্র—উজির খান ও লাখ্মীর খান। এঁরা যখন নুরপুরে বসবাস করেন তখনো তাঁদের হাতে কোন জমিদারী আসেনি। কি করে তাঁরা জমিদারী পেলেন তার হদিস জানতে গেলে, বর্তমান নুরপুর নিবাসী প্রাক্তন জমিদার মাননীয় মোহাঃ আতাউর রহমান খান সাহেব যাঁর বর্তমান বয়স ৫৪ বছর এবং উক্ত নুরপুর নিবাসী হাফেজ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন খান সাহেব যাঁর বর্তমান বয়স ৬৫ বছর—তাঁরা একই কথা বলেন যে, উক্ত উজির খান এবং লাখ্মীর খান যখন নুরপুরে বসবাস করেন তখন আজকের এই 'মালদহ' জেলা—'মালদহ' জেলা নামে পরিচিত ছিলনা, ছিল 'পূর্ণিয়া' জেলা।

ধীরে ধীরে ধনে-জনে উজির খান ও লাখ্মীর খান ধনী হতে থাকেন।

নুরপুরে বসবাস কালীন একদা এক রাত্রে দুই ভায়ের বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিলে, কৌশলে লাখমীর খাঁ গেটের সামনের গোলার মুখ খুলে দিয়ে প্রচুর মটরদানা ছড়িয়ে দেন। খানিক মধ্যেই গ্রামবাসীর চীৎকার হলেই ডাকাতরা পলায়ন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মটরদানার উপর দিয়ে পালাতে গিয়ে পা পিছলে পিছলে একে একে পড়তে থাকে মটরের উপর। কেউবা আবার কোন রকমে উঠে পালায়। কিন্তু সুযোগ বুঝে শেষের ডাকাতের উপর লাফিয়ে পড়েন লাখ্মীর খাঁ। আর অতর্কিতে তাঁর দুই হাতের বজ্র আঙ্গুলগুলো চেপে ধরে ডাকাতের টুঁটি—দম বন্ধ হয়ে আসে ডাকাতের। অবশেষে ডাকাতের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় লাখমীর খাঁর বজ্র হাতের মুঠোয়।

কিন্তু চারদিক এই সংবাদ ছড়াতে মোটেই দেরী হয় নি। তখন এই রতুয়া থানা—'রতুয়া' থানা নামে পরিচিত ছিল না, ছিল 'গোড় গারিবা' থানা। থানা থেকেই ছুটে আসেন পুলিশ সাহেব। এসেই থানা গোড় গারিবায় নিয়ে যান লাখ্মীর খাঁকে।

ঠিক এই সময় পূর্ণিয়ার বাহাদুরগঞ্জ নামক স্থানে বার বার এক থানার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল কিন্তু কিছু দুর্বৃত্তকারীরা বার বার সেই থানার ভিত্তি স্থাপনকে ভেঙে দিচ্ছিল। তাদের ধারণা যে, এখানে থানা হলে পুলিশ থাকবে, থাকবে আরো পুলিশের কর্মচারীরা। ফলে তাদের চুরি-ডাকাতিতে ভীষণভাবে দেখা দেবে অসুবিধা। তাই তারা কোন মতেই উক্ত থানার ভিত্তি স্থাপন করতে দিচ্ছিল না। দিনে যতটা তৈরী হত রাত্রে এসেই তারা ভেঙে দিয়ে চলে যেত।

তাই পুলিশ সাহেব, লাখ্মীর খাঁর বীরত্ব দেখে দারোগার চাকুরী দিলেন লাখ্মীর খাকে। এবং উক্ত দুর্বৃত্তদের দমন করে বাহাদুরগঞ্জ থানা স্থাপনের জন্য তাঁকে পাঠানো হল ঐ বাহাদুরগঞ্জ এলাকায়।

বলা বাহুল্য যে, লাখ্মীর খাঁ মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সেখানকার ভাল ভাল লোকদের নিয়ে করলেন মিটিং, তিনি বুঝিয়ে বললেন—মন্দ লোকেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি এবং সেখানকার ধনী লোকদের সর্বনাশ করার জন্যই থানা স্থাপন করতে দিচ্ছে না। এই ব্যাপারে তিনি সাহায্য

চাইলেন সেখানকার লোকদের কাছে। নিজেদের সর্বনাশ বুঝতে পেরে সবাই প্রাণ খুলে সাহায্য করলেন লাখমীর খাঁনকে এবং মাস খানেকের মধ্যেই স্থাপন করা হল পুর্ণিয়ার 'বাহাদুরগঞ্জ' থানা।

কিন্তু বাহাদুরগঞ্জ থানায় মাস দু'এক দারোগার চাকুরী করার পর খান সাহেবের আর ভাল লাগল না। সংকল্প নিলেন চাকুরী ছাড়ার। তখন ভারতে চলছিল বৈতশাসন। লাখমীর খান চাকুরী ছেড়ে আর কিছু চান কিনা, এই কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—হুজুররা হাতে তুলে যা দেবেন তাই-ই নেবেন। তখনই লাখমীর খাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয় 'কোরল্লা', 'বরমপুর', 'ফরিদপুর', 'মাধাইপুর', 'গৌরীপুর', 'তাজপুর', 'হারজিনগর', 'সেকপুর' ইত্যাদি জমিদারী। যে জমিদারী নুরপুর, সাহাপুর জমিদারের বংশানুক্রমে বংশধররা দীর্ঘকাল ভোগ করার পর একদা ভারত সরকার কর্তৃক উচ্ছেদ করা হয়।

এবারে আসা যাক 'সাহাপুর' জমিদার ও জমিদারীর ব্যাপারে। আগেই জানানো হয়েছে যে, হজরত দানশাহর পরলোকগমনের পর সাহাপুর জমিদারীর জমি জমা নিষ্কর সম্পত্তি ইত্যাদির মালিক হন পীরের ছোট ভাই শাহ আশক হোসেন। আশক হোসেনের একমাত্র কন্যা মুলন খাতুনের সাথে তদানিন্তন সম্ভ্রান্ত বংশীয়—ধুমন খান-এর বিয়ে হয়। আশক হোসেনের পরলোকগমনের পর সাহাপুর সমস্ত জমিদারীর জমি-জমা জলকর নিষ্কর সম্পত্তি ইত্যাদির মালিক হন পীর বংশের শেষ প্রদীপ বিবি মুলন খাতুন। এই মুলন খাতুনের নামের জমিদারীর প্রভাবে ধুমন খান-এর আরো ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পরে এই জমিদারীর কিছু কিছু অংশ ওপার নুরপুরের কিছু জমিদার কিনে নেন। হজরত পীর দানশাহর জমিদারী, সাহাপুর/নুরপুরের জমিদারের বংশানুক্রমে বংশধররা দীর্ঘকাল ভোগ করার পর একদা ভারত সরকার ভারতের অন্যান্য জমিদারী উচ্ছেদ করার সাথে সাথেই সাহাপুর জমিদারীও উচ্ছেদ করেন। তবে এখনো তাঁর নিষ্কর সম্পত্তি হাবেলি নামক জায়গায়—অনেক প্রজা বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। দানশাহর সাহাপুর জমিদারী চলে গেলেও আজও তাঁর সাহাপুর হাবেলির বসতভিটা, সেই নিমগাছ আর পাক-পবিত্র

পাথরদ্বয়—যেন ক্ষণে ক্ষণে ঘোষণা করে চলেছে—হজরত পীর দানশাহ পাক হ্যায়—অমর হ্যায়।

দানশাহর সাথে যাঁরা এসেছিলেন

আগেই বলেছি পীর নিয়ে এসেছিলেন কয়েক সম্প্রদায়কে। কেন এনেছিলেন তাও বলা মুস্কিল। তবে ঐশ্বরিক সূত্রে বোঝা যায় ঈশ্বর যুগে যুগে প্রয়োজন বোধে এক এক এলাকায় সাধক সন্ন্যাসী, পীর, ওলি গাউস, কুতুব, পয়গম্বর প্রভৃতিকে প্রেরণ করে থাকেন, তাই হয়তো সেই সূত্রে তিনিও এসে থাকতে পারেন। যাই হোক বলছিলাম পীর সঙ্গি সম্প্রদায়ের কথা।

পীরের সাথে যেসব নাপিত, ধোপা, জেলে, মুচি প্রভৃতি এসেছিলেন তাঁরাও সবাই বসবাস করেন এই সাহাপুর গ্রামেই। আজ তাঁদেরও বংশধররা বংশানুক্রমে সবাই দিন যাপন করে চলেছেন সাহাপুর, মাধপপাড়া প্রভৃতি গ্রামে। নাপিতদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ এখনো জীবিত আছেন যাঁর নাম গুধন চন্দ্র প্রমাণিক, বয়স ৮৪ বছর। এঁর মুখেও হজরত দানশাহ ও জামাহিরপীর গোস্বামীর আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অনেক কিছু শোনা যায়।

পীর ও তাঁর আধ্যাত্মিকতা

(১) আগেই বলেছি হজরত দানশাহ ছিলেন সিরাজদৌলার পীর (ধর্মগুরু)। কারো কারো মতে দানশাহ, 'দানশাহ ফকির' নামেও পরিচিত ছিলেন। ফকির তো বটে, তবে দ্বারে দ্বারে কারো কাছে হাত পাতার ভিক্ষুক ছিলেন না, ছিলেন ফকির-দরবেশ। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে এই দানশাহ ফকিরই নাকি তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সিরাজকে ধরিয়ে দেন। কিন্তু পূর্ব অপমানটা ই-বা কি, কেউ আর লিখিত ভাবে প্রকাশ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক, যা প্রচলিত লোকমুখে শোনা যায় তা হচ্ছে এই— সিরাজের বেগম লুৎফারও নাকি পাটনার দিককার এক পীর ছিলেন। বেগম লুৎফার মুখে প্রায়ই সিরাজ শুনতেন যে, তাঁর পীর থেকে লুৎফার পীরই নাকি গুণে-জ্ঞানে বড়। তাই কে বড় আর কে ছোট এই নিয়ে একদা মুর্শিদাবাদ রাজ প্রাসাদে দুই পীরকে ডেকে পরীক্ষা করা হয়।

শুরু হল পরীক্ষা। প্রথমতঃ দানশাহ এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চান নি। শেষে সিরাজের অনুরোধে তাঁকে নামতে হয় এই মান-সম্মানের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু পরীক্ষা হবে কেমন করে? কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধান্ত হল যে, বেশ কিছু কাঠ জমা করে লাগাতে হবে আগুন আর ঐ আগুনে ফেলতে হবে দুই পীরকে তাঁদের মাথার পাগড়ি খুলে। যাঁর পাগড়ি পুড়ে যাবে তিনি হবেন ছোট আর যাঁর পুড়বেনা তিনি হবেন বড়।

আগুন লাগানো হল। ফেলে দিলেন দুই পীর নিজ নিজ পাগড়ি। কিন্তু মজা হল কারুরই পাগড়ি পুড়ছেনা দেখে লুৎফার পীর জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'পুড়ে যা দানশাহর পাগড়ি!' কিন্তু না, কোন মতেই দানশাহর পাগড়ি পুড়লোনা। এবারে দানশাহর পালা। তিনিও অনুরূপভাবে বলতে লাগলেন, 'পুড়ে যা লুৎফার পীরের পাগড়ি!' শোনা যায় তৎক্ষণাৎই লুৎফার পীরের পাগড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আগুন আর তখনি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় পাগড়িখানা।

কিন্তু সিরাজের আনন্দ দেখে কে ! তিনি মহানন্দে হো হো করে হাসতে থাকেন—ওদিকে প্রচণ্ড ক্ষোভে আর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে কাল নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন বেগম লুৎফা।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে। দুই পীরের খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। সুযোগ তো সুযোগ এই সুযোগ। লুৎফা নাকি তাঁর মাথায় তেল মাখার সোনার বাটিটা চুপি চুপি দানশাহর ঝুলিতে ভরে দিয়ে সরে পড়েন। কিছুক্ষণ পর পাটনার পীর পাটনার পথে আর সাহাপুর বাহারালের পীর বাহারালের পথে অগ্রসর হলেই খোঁজ পড়ে সোনার বাটিটার। সিরাজের কাছে বার বার বলতে থাকেন লুৎফা—সিরাজের মহামান্য পীরই নাকি বাটিখানা নিয়ে যাচ্ছেন চুরি করে। পীরের বদনাম শুনে লুৎফার উপর ক্ষিপ্ত হলেন সিরাজ। ডাকা হল দুই পীরকেই। ঝাড়া হল পীরদ্বয়ের ঝুলি। আর তৎক্ষণাৎই বের হয়ে পড়ল দানশাহর ঝুলি থেকে লুৎফার বাটিখানা। চমৎকার পরীক্ষা—চমৎকার প্রহসন।

শোনা যায় জ্বল জ্বল করে দুই চক্ষু জ্বলে উঠে সিরাজের। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তিনি নাকি ক্ষিপ্ততার বশে বলে ফেলেন—তুমি যদি আমার পীর না হতে তাহলে গাধার পেচ্ছাবে তোমার দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বিদায় দিতাম। কারো কারো মতে সিরাজ নাকি দানশাহর নাক, কান কাটিয়ে নিয়েছিলেন। পরে দানশাহ কৃত্রিম নাক, কান ব্যবহার করতেন।

এই ঘটনার বিবরণ যেসব বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, তাঁরা কিন্তু দানশাহর নাক, কান কাটার কথা অস্বীকার করেন। তাঁরা সবাই এই ব্যাপারটাকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেছেন। এমন কি গাধার পেচ্ছাবে দাড়ি গোঁফ কামানোর কথাটিও তাঁরা অস্বীকাব করেন।

তবে অনেক ঐতিহাসিকরা বলেন—দানশাহ তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সিরাজকে ধরিয়ে দেন।

সিরাজ যে দানশাহকে অপমান করেছিলেন, এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধরা বলেন—যেসব ঐতিহাসিকরা এই পূর্ব অপমানের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই অপমানের ঘটনায় বিবরণটা তাঁহাদের ইতিহাসে উল্লেখ করেন নাই কেন ? শুধু কি, 'পূর্ব অপমান'—নাসা-কর্তনের কথা বলিয়াই খালাস ? আর যদি সিরাজদ্দৌলা উক্ত ব্যাপারে দানশাহকে অপমান করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে সিরাজদ্দৌলা কতখানি দোষী তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

পীরদ্বয়ের পরীক্ষা আর লুৎফার বাটি হরণের ব্যাপার জানতে গেলে বৃদ্ধরা বলেন—মুর্শিদাবাদ রাজ প্রাসাদে পীর পীরে পরীক্ষা হইয়াছিল ইহা শুনিয়াছি। কিন্তু লুৎফা যে ছলনা করিয়া দানশাহকে অপমান করিয়াছিলেন এবং সিরাজ যে দানশাহর নাক, কান কাটাইয়াছিলেন ইহা শুনি নাই।

যাই হোক, অপমানের প্রতিশোধ এবং সিরাজের ধরা-ধরির ব্যাপারে আসছি পরে, এখন দানশাহর আর কয়েকটি আধ্যাত্মিক শক্তির বিবরণ দিয়ে শেষ করতে চাই এদিকটা।

(২) বর্তমান কমলপুর গ্রামের ৺শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় যিনি ৯৩ বছর বয়সে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন তাঁর মুখে এবং মাধবপাড়ায় শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, বয়স ৮২ বছর, শ্রীগুধন চন্দ্র প্রামাণিক বয়স ৮৪ বছর এঁদের মুখে এখনো হজরত দানশাহ এবং গোসাঁইজীর অনেক কথা শুনে আসছি।

৺শরচ্চন্দ্র দাস, যাঁর মাথায় বিরাট টাক, মুখ ভর্তি ঋষিসুলভ দাড়ি-গোঁফ, যাঁর মুখ তাকালে শ্রদ্ধায় মন বিগলিত হয়ে যেত, এঁকে নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে তবুও সংক্ষিপ্তাকারে বলি—যাঁর ৪৫ বছর বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হলে বাহাদুরপুর গ্রামের ভুবন বাবু পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব তুললে তিনি যুক্তি দেন,"দেখুন আপনি আমার মিত্‌বাবা, আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু যে দেহ, যে মন-প্রাণ-ভালবাসা আমার স্ত্রী আমাকে দান করেছেন, আমি আমার দেহ, মন-প্রাণ-ভালবাসা তাকে দান করেছি, আজ সেই দেহ, মন প্রাণ ভালবাসা অন্যকে দেবো কি করে ? দ্বিতীয় বিয়ে করবো হয়তো সংসার বাড়বে, আমার প্রথম পক্ষের সন্তানদের সাথে বনিবনা হবে কিনা তাও সন্দেহ, না না মিত্‌বাবা আমায় ক্ষমা করুন।" প্রত্যুত্তরে আর কোন কথা বলেননি

ভুবন বাবু। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই চুপ হয়ে যান।

কিছুদিন বাদেই উক্ত ভুবন বাবুরও স্ত্রী বিয়োগ হলে তিনিও শোক সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। ফলে একদিন এই শরৎ বাবুর অনুরোধে উভয়েই চলে যান নবদ্বীপ। সেখানে দীর্ঘ ৭/৮ মাস থাকার পর দু'জনেই ফিরে আসেন দেশে। কিন্তু সেই উদাসী শ্রদ্ধেয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করে একাই চলে যান ভগৎ রায়ের টাঁরী। এই ভক্ত ভগৎ রায়কে নিয়েও তাঁর মুখে অনেক কিছু শুনেছি। যাই হোক শরৎ বাবু সেই ভগৎ রায়-এর টাঁরীতেই এক আশ্রম তোলেন। যেখানে দীর্ঘ ১৯ বছর ঈশ্বর সাধনায় রত হন। মাত্র পাঁচ বছর আগে তাঁর অসুখ-বিসুখ নানা অসুবিধা দেখা দিলে, তাঁর পুত্রদের অনুরোধে ফিরে আসেন আবার নিজ গ্রাম কমলপুরে। তাঁর মাছ-মাংস প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য ছিল পরিত্যাজ্য। তাঁর তিন পুত্র দুই কন্যা। পুত্র-কন্যার বংশধরদের নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটাতেন। নানা ধর্মতত্ত্ব কথা শোনাতেন, নানা উপদেশ দিতেন—যাঁর কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসলেও ওঠার মন করতনা। জীবনের ৯৩ বছর ধাপেও অগাধ স্মরণশক্তি ছিল তাঁর।

যাই হোক, দানশাহ ও গোসাঁইজীর ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "হজরত দানশাহ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তিনি সকল জাতির পীরবাবা ছিলেন। একদিন আমি গরু গাড়ীতে কুড়ি মণ ভুট্টা বস্তায় নিয়ে ভোরের সময় হাট রওয়ানা দিয়েছি। গাড়ীতে আমি আমার গাড়োয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকছে। পীর সাহেবের দরগাহ পেরিয়ে রতুয়ার ডাকবাংলার একটু এদিকেই জানিনা কেমন করে গাড়ীর এক চাকা একটু গর্তে পড়ে মালশুদ্ধ গাড়ী উলটে পড়ল। ছিটকে পড়লাম আমি একদিকে আর এক-দিকে ছিটকে পড়ল আমার গাড়োয়ান। অবাক হলাম আমরা। বলদ দুটো দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাতের আভাস আলোও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন জন-মানুষকে দেখতে পাচ্ছিনা, গাড়ী যে তুলবো কেমন করে—বসে বসে ভাবতে লাগলাম মাথায় হাত দিয়ে। আর এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল

আমার পীর সাহেব দানশাহকে। আমি মনে মনে স্মরণ করলাম, পীরবাবা, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। বলা বাহুল্য যে, কে যেন ভর করলো আমার দেহে। বলল গাড়ীতে হাত লাগাতে। আমি উঠেই চাকরকে বললাম, ধর্—এক চাকায় তুই হাত দে, আর অন্য চাকায় আমি দিচ্ছি। গাড়োয়ান তো হাসতে লাগল, কুড়ি মণ মাল, একে কি দুজনে উঠানো যায় ? আমি বললাম তুই হাত দে—এই বলেই চাকায় হাত লাগিয়ে বললাম, পীর সাহেব বাবা—মেরা গাড়ী উঠা দিজিয়ে। আর কি বলব, সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ি মণ মাল সমেত গাড়ী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল চোখের নিমেষে। মহানন্দে হাট থেকেই নিয়ে আসলাম সওয়া সের মণ্ডা। পীর সাহেবের দরগাহে শিরণী দিয়ে মনের আনন্দে ফিরে এলাম বাড়ী।

(৩) তিনি আরো বললেন—আর একদিনকার ঘটনা। আমাদের এখানকার শক্রুঘ্ন সাহার স্ত্রী মুন্সিয়ান করতেন কবরাজি। যাঁর এখনো এখানে মুন্সিয়ানের ভিটা বিরাজমান। সেই মুন্সিয়ান গিয়েছিলেন কবরাজি করতে রতুয়ার দিকে। বৃদ্ধা মানুষ, বাড়ী ফিরতে তাঁর বিকেল হয়ে যায়। সেই বিকেলেই রতুয়া থেকে পাড়ি জমিয়েছেন কমলপুর। তখনকার যুগে চারদিক ভীষণ ঘন জঙ্গল। বাঘ, ভালুক কত থাকতো তার হিসেব নেই। মুন্সিয়ান রতুয়ার বর্তমান ডাকবাংলার কাছে এসে ভয়ে আগে পিছে তাকাতে লাগলেন। বলা যায় না, কাছে কিছু দিনমানের ঘামঝরা পয়সা আছে, বৃদ্ধা হলেও পরমা সুন্দরী, বাঘ-ভালুক এবং চোর বদমাসের ভয়ে তাঁর আর পা কোন মতেই এগুতে পারছেনা। তিনি হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন কে একজন তাঁর পেছনে বৃদ্ধগোছের যাঁতা কুট্টার মত লোক ধীর পায়ে আসছেন। সাহস পেয়ে মুন্সিয়ান বুড়ি হাঁটতে লাগলেন। হাঁটছেন আবার কখনো পিছন ফিরে দেখছেন। এমনি করতে করতে দানশাহর দরগাহ পেরিয়ে ঠিক কমলপুর সীমানায় যেমনি মুন্সিয়ান ঢুকে পড়েছেন অমনি বুড়ি মনের আনন্দে পেছনে ফিরে তাকাছিলেন ঐ পিছনের পথচারীকে। কিন্তু হায়, কোথায় সে পথচারী! দেখতে দেখতেই চোখের নিমেষেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল ঐ পবিত্র আত্মাটি।

শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবু বললেন—'কতবার আমি নিজ কানে শুনেছি ঐ বৃদ্ধা

মুন্সিয়ানের মুখে এই ঘটনা। শুধু তাই-ই নয় পরদিন প্রভাতেই ঐ মুন্সিয়ান পীর সাহেবের দরগাতে বেশ কিছু বাতাসা নিয়ে শিরণী দিয়ে এসেছিলেন। বুঝলেনা বাবা, হজরত দানশাহ তোমার আমার সবার পীর। তিনি মরেণ নি, তিনি আমাদের চোখের আড়ালে হয়ে আছেন, থাকবেনও চিরকাল।

(৪) গোসাঁইজীর ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মুখে যা শোনা যায় তা শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবুও একই কথা বললেন—'হজরত দানশাহ আর জামাহিরগীর গোস্বামীর সাথে বেশ হৃদ্যতা ছিল। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি—দানশাহ গোসাঁইজীকে আমন্ত্রণ জানালে গোসাঁইজী বাঘের উপরে চেপে সাক্ষাৎ করতে আসেন দানশাহর কাছে। দানশাহ তখন তাঁর পাথরে বসে দাঁতন করছিলেন। বন্ধুকে বাঘের উপর আসতে দেখে তিনি বললেন তাঁর পাথরকে—চল্ চল্ বন্ধু আসছেন, তুই বসে আছিস ? বন্ধুকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে যে ! এই বলাতেই পাথর দানশাহকে পিঠে করে এগিয়ে নিয়ে যায় গোসাঁইজীর কাছে। গোসাঁইজী বাঘ থেকে নেমেই বললেন—দোস্ত, যো হোনা সো তো হো চুকা, লেকিন আপহি ব্যাড়ে (বড়)। কিন্তু হজরত দানশাহ আর পাথরে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পাথর থেকে নেমেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন গোসাঁইজীকে আর দু'জনে মনের আনন্দে হাসতে লাগলেন।' যাই হোক, এই ঘটনা আজো সাহাপুর বাহারালে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সব লোকেরই মুখে শোনা যায়, গোসাঁইজীর বাহন ছিল বাঘ আর দানশাহর বাহন ছিল পাথর ; যে পাথর আজো পড়ে আছে তাঁর বসতভিটার নিমগাছের গোড়ায়।

(৫) একদিন দানশাহর সমাধি দর্শনে শুনলাম রতুয়ায় বসবাসকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীপঞ্চানন চন্দ মহাশয়ের মুখে। যাঁর বয়স তখন ৮২ বছর। যিনি সারা জীবন সাহিত্য সাধনায় রত ছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের গ্র্যাজুয়েট। বৃটিশ পেরিওডে এক কোম্পানীতে আড়াই শো টাকা বেতনে কাজ করতেন। কিছুদিন চাকুরী করার পর যখন মেশিনে আজে বাজে যন্ত্রপাতি লাগাতে শুরু করা হল, তিনি করলেন প্রতিবাদ। ফলে মতবিরোধ ঘটল মালিকের সাথে আর তখনই আড়াই শো টাকা বেতনের চাকুরী ছেড়ে দিয়েই নামলেন সাহিত্য সাধনায়। তাঁর মুখেই আমি ও

আমার অনেক বন্ধু এই রতুয়ায় শুনেছি – গীতাঞ্জলী লেখে যখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান, তখন এই চন্দ মহাশয় হন্তে হয়ে কোলকাতার বুকে ছুটে বেড়ান গীতাঞ্জলীর উদ্দেশ্যে। শেষে এক দোকানে পেয়ে নিয়ে আসেন বাড়ী। বলা বাহুল্য যে তিনি তিনবার তিন প্রকারে গীতাঞ্জলীর ব্যাখ্যা করে পাঠান রবীন্দ্র নাথের কাছে।

চন্দ মহাশয় তাঁর পুত্র শ্রীশৈলেন চন্দ বাবুর এই রতুয়া ব্লকে চাকুরী হলেই কলকাতা থেকে ছেলের সাথে চলে আসেন রতুয়ায়। অনেকেই দেখেছেন এক বৃদ্ধ কোন গাছ তলায় কিংবা কারো ঘরের বারান্দায় কিংবা রতুয়ার ঐ ডাকবাংলোয় বসে বসে দিনের পর দিন লেখেই চলেছেন। তাঁর হাতের লেখা বড় দুর্বোধ্য। কিন্তু আশ্চর্য্য যে তাঁর এত এত লেখা কোথায় যেত, কোথায় আছে কিছুই জানা নেই।

তবে কিছুদিন আগে তাঁর পুত্র শ্রীশৈলেন বাবুর মুখে শুনতে পেলাম. কিছু লেখা কোলকাতায় তাঁর নাতীর কাছে আছে এবং রতুয়ায় যে আলমারীতে তাঁর প্রচুর পাণ্ডুলিপি ছিল বর্তমানে সবই উই পোকাতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। যাই হোক রতুয়ার বুকে তখন আমাদের 'সমান্তরাল' সাহিত্য পত্রিকা পুরোদমে চলছিল। তাই কোন রকমে প্রায় জোর করে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলাম উক্ত সমান্তরাল-এর বুকে।

সেই চন্দ মহাশয়ের একদিন ইচ্ছে হয়েছিল হজরত দানশাহর সমাধি দর্শন করার। এই সমাধি দর্শনের ব্যাপারে তিনি যা আমার কাছে ব্যক্ত করলেন, তা হল এই—"দ্যাখো, কয়েকদিন আগে আমার বড় ইচ্ছে দানশাহর সমাধি দেখার। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। কিন্তু কোথায় আছে সেই সমাধি, আমার জানা নেই। লোকমুখে শুনেছি তালবনাতে নাকি দানশাহর সমাধি আছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে ডাকবাংলোর কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি—কোথা থেকে একটি দশ এগারো বছরের ছেলে এসে আমায় বলল, 'কোথায় যাবেন ?' আমি বললাম, ঐ দানশাহর কবর দেখতে যাবো, কিন্তু কোন্‌খানে আছে আমি দেখিনি, তুমি কি দেখেছো ? ছেলেটি বলল—আসুন আসুন! আমি

আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। এই বলে ছেলেটি আমার আগে আগে যেতে লাগল। তারপর কিছুদূর নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গার কাছে হাতের ইশারাতে ক'একটি গাছ দেখিয়ে বলতে লাগল—"ঐখানে চলে যান. ঐখানে দানশাহর কবর আছে।" আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম ছেলেটিকে। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলাম কেউ নেই। কোথায় গেল ছেলেটি! হঠাৎ যেন আমার গা শিউরে উঠল। আমি দানশাহকে মনে মনে স্মরণ করে ফিরে এলাম বাসায়।

এই চন্দ মহাশয়ের কাছে আমি অনেকদিন বসে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা শুনেছি। এক এক ঘটনা বলেন আর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে। দানশাহর সমাধি পরিদর্শনের উক্ত ঘটনাটি বলতে গিয়েও দু'তিন বার চোখের জল মুছতে দেখেছি। আজ চন্দ মশাই নেই, মনে আছে তাঁর স্মৃতি চারণের কথাগুলো। শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন চন্দ মহাশয় ১৯৭৬ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও শোনা গেছে তাঁর মৃত্যুশয্যার উপর অনেক টাটকা তাজা লেখার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল।

(৬) প্রাক্তন জমিদার হাজী মোহাম্মদ আলী হায়দার খাঁ সাহেবের মুখে যা শুনলাম, তা হচ্ছে এই—একদিন হজরত দানশাহ এক নাপিতের সামনে তাঁর বসতভিটায় বসে চুল কাটাচ্ছেন। এমন সময় নাপিত দেখতে পেল হঠাৎ দানশাহ চোখ বন্ধ করে যেন লোহার মত শক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তারপর তাঁর গলার নীচে সমস্ত দেহ থেকে ঝরতে লাগল ঘাম। এত জল বের হতে লাগল যে, মনে হচ্ছে তিনি স্নান করে চলেছেন। মুখে কোন কথা নেই। নাপিত অবাক হয়ে বন্ধ করলো কাঁচি চালানো। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল বোবার মত। তারপর কিছুক্ষণ বাদে দানশাহ খুললেন চোখ। নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন ঘন ঘন। নাপিত অবাক হয়ে ব্যাপারখানা জানতে চাইলে তিনি বললেন—এই মাত্র নদীতে এক বণিকের অনেক মূল্যবান মালসহ নৌকা ডুবে যাচ্ছিল। বণিক আমাকে স্মরণ করেছিলেন। তাই আমি তার নৌকাটাকে অতি পরিশ্রমে কিনারায় লাগিয়েছি। এই ঘটনা এখানেই শেষ নয়—

তার কিছু বাদে বণিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন দানশাহর কাছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, আশীর্বাদ নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন নৌকার কাছে। এই ঘটনা শুধু হাজী আলী হায়দর খাঁ সাহেবেরই মুখে শুনিনি, কিছুদিন আগেও শুনে এলাম শ্রদ্ধেয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখেও।

(৭) আর একদিনকার ঘটনা—তখন বৃটিশ সরকারের চাবুক চলছে ভারতবর্ষে। আমাদের আজকের এই বাহারাল—মাধবপাড়ার রায় বংশের ত্রিলোচন রায় মহাশয় গিয়েছিলেন ঐ কালিন্দ্রী নদী পেরিয়ে কাহালা গ্রামে কোন এক কাজে। বাড়ী ফিরে আসতে তাঁর বেশ রাত্রি হয়ে যায়। একা একা গুন্ গুন্ স্বরে গান করে আসছেন রায় মশাই। রতুয়ার নিকটবর্তী 'ফাজিল ঘাট'—যার কাছাকাছি এখন গড়ে উঠেছে মণিপুর গ্রাম, মণিপুর রঙ ফেক্টরী। ঘাটের এপারেই রয়েছে শ্মশান। এখনো সেখানে রতুয়া ও তার আশ পাশ অঞ্চলের মৃতদেহ পুড়ানো হয়। রায় মশাই নদীর হাঁটু জল পেরিয়ে আসছেন শ্মশানের পাশ দিয়ে।

গভীর রাত। শ্মশানের কাছাকাছি এসেই রায় মশায়ের কানে ভেসে এল শ্মশান থেকে ঠুক্ ঠাক্ শব্দ। কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল এক কাঠমিস্ত্রী এবং এখানেই তাকে পুড়ানো হয়েছিল। রায় মশাই ভাবলেন আর কিছু না, ঐ মিস্ত্রীটাই নাকি ভূত হয়ে ভয় দেখাবার জন্য ঠুক্ ঠাক্ করে চলেছে। তিনি কিছুটা ভয় ও সাহসের মাধ্যমে বলে উঠলেন, 'শালা জিন্দাতেও ঠুক্ ঠুক্ আর মরাতেও ঠুক্ ঠুক্ রে!' আর যাই কাহাঁ, দেখা গেল শ্মশান থেকে উঠেই বেশ কয়েক জন ভূতের মত ছায়া তাড়া করল তাঁকে। তিনি যাইতো যাই কাহাঁ। কে রক্ষা করবে তাঁকে এই বিপদ থেকে। রায় মশাই আর কিছু সাত পাঁচ না ভেবে ভীষণ চিৎকার করে প্রাণপনে ছুটলেন হজরত দানশাহর সমাধির দিকে।

কিন্তু পিছন থেকে ঢিল পড়ছে রায় মশায়ের আশে পাশে। রায় মশাই প্রাণের শেষ সীমার শেষ সংকেত বুঝতে পেরে বিকট চিৎকার করে ছুটতে লাগলেন—'পীর সাহেব—আমাকে বাঁচান পীর সাহেব, আমাকে মেরে ফেল্লে ওরা!' শোনা যায় তিনি ভীষণ ক্লান্ত দেহে ছুটে এসেই

পড়লেন পীরের সমাধির পাশে। আর তখনই সাদা পাগড়ি, পাঞ্জাবী, পাইজামা পরিহিত কে একজন এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। রায় মশায়ের জ্ঞান ফিরলে উক্ত সাদা ধবধবে পাগড়ি দাড়িওয়ালা লোক তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে বললেন, 'চল্ চল্, কোন ভয় নেই, চল—তোকে রেখে আসি তোর গৃহে।'

রায় মশায়ের বিবৃতিতে শোনা গিয়েছিল যে, তাঁর বাড়ী পর্যান্ত ঐ পবিত্র আত্মাটি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন রায় মশাইকে। শুধু তাই নয়—তিনি আরো কতজনের কাছে সগর্বে বলেছেন, 'মুরদা তো মুরদা মুসলমানের মুর্দা।' রায় মশায়ের এই ঘটনার কথা আমিও আমার দাদুর মুখে কতবার শুনেছি এবং এখনো বৃদ্ধ পিতা সেখ ইব্রাহিম যাঁর বর্তমান বয়স ৮২ বছর তাঁর মুখে এবং বাহারালের আরো অনেক বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়র মুখে শুনে আসছি। যাই হোক সেই রায় বংশের বংশধররাও এখনো ঐ প্রাচীন রায় পাড়াতেই বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। আর সেই প্রাচীন কাল থেকেই হজরত দানশাহর দানেই হোক আর যে কোনও কারণেই হোক এখানকার হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায় যেন সবাই এক গোত্র—এক ভাষী—একই রক্তে সবাই মিশে গেছেন এক অপরূপ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে। সবাই সকলের ভাষা বুঝতে পারছেন। সবাই সকলের ভাষায় কথা বলতে পারছেন। এক সাথে খাচ্ছেন দাচ্ছেন—এমন সুখ, এমন আনন্দ আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। এখনো সাহাপুর বাহারালের সাথে যদি আর কোন বাহিরের গ্রামের সাথে ঝগড়া বা মারামারি লাগে তাহলে হিন্দু মুসলমান সকলেরই মুখ দিয়ে একই কথা—হ্যাঁট্, হ্যাঁট্ এ হাজর্যাতে বাহারাল হ্যায়।

হজরত দানশাহ (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে নানা লোকের মুখে নানা রকম কথা শুনে থাকলেও, তাঁর যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিরাট একটা গুণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর তা না হলে অকারণে নবাব সিরাজদৌলা এক ফকিরকে সাহাপুর জমিদারী, জলকর, নিষ্কর সম্পত্তি দান করতেন না। আর দানশাহ (রাঃ) যদি সত্যিকারের পীর না হতেন তা হলে সেই প্রাচীন কাল থেকেই আজ পর্যান্ত জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে

সকলের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি যে, পীরের দরগাহে সবাই আপদে-বিপদে ছুটে যাবেন আর তাঁদের মানত পরিশোধ করে আসবেন যুগ যুগ ধরে।

পীরের সমাধিতে স্মৃতিসৌধ গড়ার পরিকল্পনা

সম্ভবতঃ ১৯৭১ কি '৭২ হবে। হঠাৎ একদিন বাহারাল অঞ্চল পঞ্চায়েৎ অফিসে এলেন রতুয়া ১নং ব্লকের বি, ডি, ও, মাননীয় শ্রীহরলাল মিস্ত্রী মহাশয়। তাঁর সঙ্গে এলেন বাহারাল নিবাসী রতুয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীগোবর্দ্ধন লাল সিংহ মহাশয়, সহ শিক্ষক সর্বজন প্রিয় আব্দুস সহিদ। (রতুয়া অঞ্চলের প্রধান) এবং ডাক্তার মহঃ মকসুদ আলী প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

মিটিং হল বাহারাল পঞ্চায়েৎ অফিসের সামনে। মিটিং-এ যোগ দিলেন সাহাপুর, মাধবপাড়া, বাহাদুরপুর ও বাহারালের বেশ কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলিম। মিটিং-এর আলোচ্য বিষয় জানতে চাইলে বি, ডি, ও, মহাশয় উঠে এই ধরণের কথা বলেন— 'সরকার থেকে একটা নির্দেশ এসেছে, থানায় থানায় সবাই খোঁজ করুন, যদি কোথাও কোন ঐতিহাসিক স্থান পাওয়া যায় তাহলে সেখানে মর্মর দ্বারা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে সরকারী খরচে। আমরা শুনেছি এই রতুয়া থানার অন্তর্গত 'তালবনা' নামক জায়গাতে নবাব সিরাজদৌলার পীর দানশাহের সমাধি রয়েছে। অতএব সেই সুত্রে সমাধি স্থলে স্মৃতিসৌধ-এর ব্যবস্থা এবং বাহারাল মোড় থেকে পশ্চিম মুখে যে রাস্তাটি চলে গেছে পীরের সমাধি পর্যন্ত, এটিকেও পাকা রাস্তায় পরিণত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করছি।

আর এও ঠিক যে, আমার থাকা কালীন যদি এই কাজটা করে যেতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

খুব মনে আছে, সেদিন রতুয়া হাই স্কুলের সর্বজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আব্দুস সহিদ সাহেব, ডাক্তার মকসুদ আলী, সাহাপুর, বাহারালের প্রাক্তন জমিদার মোহাম্মদ মজিত্বর রহমান খাঁ সাহেব, মাননীয় শ্রীফণী ভুষণ সিংহ মহাশয়, এবং আমার গ্রামের আব্দুস সাত্তার সাহেব প্রমুখ সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন—'হোক হোক, এটা অতি সত্বরই হোক।' কিন্তু হবে কি! হঠাৎ যেন কোথা থেকে এক কাল বৈশাখীর ঝড় এসে সমস্ত সাজানো গোছানো সংসারকে তছনছ করে দিয়ে চলে গেল মুহূর্তে। শত মণ জমানো দুধে যেন পড়ে গেল কয়েক ফোঁটা লেবুর রস।

কয়েকজন স্বার্থান্বেষী মানুষ ভাবলেন—আমাদের পাড়ার রাস্তায় আজ অবধি ইঁট পড়লোনা, ভবিষ্যতে কোনদিন পড়বে কিনা তাও সন্দেহ। অথচ আজ বাহারাল মোড় থেকে দানশাহ ফকিরের দরগাহ্ পর্যন্ত বসতে চলেছে ইঁট, হতে চলেছে পাকা পথ। ওরা বর্ষাকালে হাঁটবে পায়ে জুতো দিয়ে, আর আমরা? না না, এ কোন মতেই হতে পারেনা।

সঙ্গে সঙ্গেই এক চতুর চালাক বুদ্ধিমান পরিচয় দিলেন তাঁর বুদ্ধির। বললেন, 'দেখুন এটা তো অনেক দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। আজ যে হতে চলেছে এটা অতি আনন্দের বিষয়। আমাদের বাহারালের একটা গৌরব। তবে নবাব সিরাজদৌলার সাথে দানশাহ কতটা যুক্ত ছিলেন, কতদূর তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, সত্যিকারে তিনি সিরাজের পীর ছিলেন কি না, আর যদিও ছিলেন তাহলে তাঁর যে আজ যেখানে সেখানে একটা বদনাম চলছে— তিনিই নাকি সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এসব তথ্য ভালভাবে জেনে নিয়েই কাজটা করা উচিত হবে মনে করি।'

সেদিন এই কথার প্রত্যুত্তরে বেশ কয়েকজন লোক যে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তা আজও ভুলিনি। বিশেষ করে মাননীয় শ্রীফণী ভুষণ সিংহ মহাশয় এবং মোহাম্মদ মজিত্বর রহমান খাঁ সাহেবের বিবৃতি আজও জ্বল জ্বল করছে। শেষে আমি স্বয়ং উঠে যখন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করলাম তখন সেই চালাক-চতুর স্বার্থান্বেষী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে

বললেন, 'আহা. তুমি রাগ করছ কেন ! বসনা ? আমিও তো চাই এটা হোক। তবে একটু অপেক্ষা কর, আমরা পুরনো ইতিহাস খুঁজে দেখে নিই !'

সেদিন বসতে বসতে আমি বলেছিলাম—ঠিক আছে, আপনারা সেই ইতিহাস দেখুন। কিন্তু আপনাদের অনীহা-অবহেলার জন্য যদি এই কাজের সুরাহা না হয় তাহলে ইতিহাসে আপনাদের কথা একদিন তুলবোই। বলা বাহুল্য যে, সেদিন চারজন শিক্ষিত ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই পুরনো ইতিহাস দেখার জন্য।

মিটিং শেষ হল। সবাই গেলেন যে যার গন্তব্য স্থলে। মাননীয় বি, ডি, ও, মহাশয় কিছুদিন বাদে চাকুরী ক্ষেত্রে গেলেন অন্যত্র বদলী হয়ে। কিছুদিন পর সর্বজনপ্রিয় শিক্ষক আব্দুস সহিদ সাহেব গেলেন স্বর্গে। একে একে আরো সেই পথে গমণ করলেন মাননীয় ফণী ভূষণ সিংহ, মোহাম্মদ মজিবুর রহমান খাঁ সাহেব। কিন্তু যে চারজনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেই ইতিহাস খুঁজে দেখতে, জানিনা আজো তাঁদের ঘুম ভেঙেছে কি না। ভাবতে অবাক লাগে বিগত ১৯৭১ কি '৭২ সাল থেকে আজ ১৯৮২ শেষ হতে চলেছে—এই সুদীর্ঘ সময়েও কি তাঁদের সেই ইতিহাস খোঁজা হয় নি ? আর কবে ? জানি, সে আর কোন দিনই খোঁজা হবে না, হবে না দানশাহর সমাধির উপর স্মৃতিসৌধ গড়া ! আজ বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি--সরকার পক্ষ থেকে যদি এই পবিত্র সমাধিতে—পীরের স্মৃতিসৌধ এবং জামাছিরপীর গোস্বামীর সমাধিতেও তাঁর স্মৃতিসৌধ গড়ার ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে জাতীয় জীবনের এক আনন্দদায়ক অবদান হয়ে থাকতো সন্দেহ নেই।

পলাশীর যুদ্ধ—বেইমানদের বিশ্বাসঘাতকতা—সিরাজের পরাজয়—আর দানশাহ ?

আমার জ্ঞান হওয়া অবধি আজও একটি কথা শুনে আসছি যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 'দানশাহ' নামটি কলঙ্কিত। কিন্তু কথা হচ্ছে এই পবিত্র নামটিকে কলঙ্কিত করেছে কারা ? উত্তরে বলতেই হয়— ইতিহাস বিকৃত করেছে যারা। আগেই বলেছি কিছু সংখ্যক লেখক/ঐতিহাসিক নামকে উয়াস্তে যে যা পেয়েছেন নির্দোষের উপর দোষ চাপিয়ে গেছেন ইচ্ছে মত। কিন্তু কথা হচ্ছে ইতিহাস কোনদিনই মিথ্যে হয় না। যদি হয় তাহলে সে উপহাস—গাল-গপ্পের কাহিনী মাত্র।

ভারতবর্ষে বেশ কিছু নামকেনা ঐতিহাসিকদের ইতিহাস, বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলোলেই লেখকদের কুকীর্তি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে চোখের কোণে। অতীতে যা চলেছে আজো সেই কুকীর্তির চাকা অবিরাম চলেছে কালের কঠিন নিষ্ঠুর দৈত্য-চাকায়, যে গতির বিরামও নেই শেষও নেই।

আলোচনা দীর্ঘ হবে তাই সংক্ষেপে লেখকদের কিছু কুকীর্তির নমুনা রাখছি। যে সম্রাট আকবর অনেকের কাছে পূজনীয় শ্রদ্ধার পাত্র—লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য বিধাতা ছিলেন, সেই পরম পূজনীয় সম্রাটের দাড়িতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবু তাঁর লেখনীতে অতি কৌশলে এক যুবতীকে দিয়ে আচ্ছা করে ঝাড়ু পিটিয়েছেন। বখ্‌তিয়ার খল্‌জিকে বলেছেন অরণ্যের বানর। মুসলমান জাতিকে আখ্যা দিয়েছেন 'নেড়ে'। তাঁর কবিতার বই-এ আরব এবং পারস্যের মুসলমান জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

"আসে আসুক না আরবী বানর
আসে আসুক না পারসী পামর"....

শুধু তাই-ই নয়—যে ঔরঙ্গজেব বিশেষ করে ইসলাম জগতে 'ফতোয়া-এ-

আলমগীর' লেখে ইসলাম ধর্মের নিয়ম শৃংখলা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নমাজ পড়তে বাদ দেননি। যিনি মুসলিম জগতে পান পীরের দর্জা। যাঁর রাজত্বে মদ্যপান ছিল নিষিদ্ধ অথচ তাঁর মত মহান সম্রাটের মুখেও কল্পিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা লাথি মারিয়েছেন। শুধু যে বঙ্কিম বাবু মারিয়েছেন তা নয়—এমনি অনেক বাবুই তাঁদের লেখনীতে পীর হাফিজ ঔরঙ্গজেবের হাতে কল্পিতা রূপবতী দাসীকে দিয়েও মদের পেয়ালা ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। মোট কথা যে যা পেয়েছেন লেখে গেছেন, লেখে চলেছেন বেপরোয়া ভাবে।

কিন্তু দুঃখ হয়—ঔরঙ্গজেব যে "অনেক মন্দিরের সাথে তারকেশ্বরের মন্দির গড়ে দিয়ে তাতে ২৫০ বিঘা নাখ্‌রাজ দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছেন" (মীযান পত্রিকার ১৯৭৫ বিশ্বনবী সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার দ্রঃ) সে কথা আজ আর নামকেনা ঐতিহাসিকদের কলম দিয়ে কালি ঝরছেনা কেন এটাই চিন্তনীয়।

আরো দুঃখ হয়—একদা মহামান্য সম্রাট ঔরংজেবের নিকট পাঞ্জাব থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের চোখে-মুখে নৈরাশ্যের ছাপ। সম্রাটের এক মুসলমান সেনাপতি যখন ব্রাহ্মণের রূপবতী কন্যাকে জোর করে বিয়ের প্রস্তুতি নেন, তখনি দুঃখে জর্জরিত নিপীড়িত অসহায় পিতা ব্রাহ্মণ ছুটে এসেই প্রার্থনা জানান ঔরঙ্গজেবের কাছে। ঔরঙ্গজেব শোনা মাত্রই ব্রাহ্মণকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে পাঠিয়ে দেন পাঞ্জাব। আশ্বাস দিয়ে পাঠান—এই মাত্র সম্রাট তৈরী হচ্ছেন পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে। আর তখনি মহামান্য সম্রাট ঔরঙ্গজেব ভিক্ষুক বেশে অতি সন্তর্পণে তাঁর সুতীক্ষ্ম তরবারী কাপড়ের আড়ালে রেখে দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে যান ঘোড়া। পাঞ্জাবে পৌঁছেই অতি গোপনে আশ্রয় নেন উক্ত ব্রাহ্মণের এক গৃহে। আর বেশ কিছুক্ষণ আল্লার এবাদতে রত হন মহামান্য সম্রাট পীর হাফেজ ঔরঙ্গজেব। দুই চক্ষু হতে দর দর করে নেমে আসে জলধারা। হয়তো আল্লার কাছে প্রার্থনায় বলতে লাগলেন—হে দিন দুনিয়ার পরম দয়ালু সর্ব প্রাণীর পালন কর্তা। আমি আমার ধর্ম পালন করতে এসেছি প্রভু। তুমি আমায় সাহায্য কর। তুমি আমায় শক্তি

দাও !! তুমি আমায় ক্ষমা কর !!!

বলা বাহুল্য যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাপতি বর বেশে ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলপূর্বক বিয়ে করতে যেমনি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করলেন, অমনি অতর্কিতে সেনাপতির সম্মুখে বীর বিক্রমে মাজা সোজা করে দাঁড়ালেন আওরঙ্গজেব। থরথর করে কেঁপে উঠল সেনাপতির সর্বাঙ্গ। আর মুহূর্তেই আওরঙ্গজেবের সুতীক্ষ্ম তরবারীর আঘাতে সেনাপতির মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল ভূমিতে। তারপর ?

তারপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বিদায় নিলেন আওরঙ্গজেব। এই ঘটনার পর থেকেই পাঞ্জাবের ঐ গ্রামটির নাম হয় "আলমগীর" গ্রাম। শোনা যায়—ব্রাহ্মণের যে গৃহে ঔরঙ্গজেব আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর এবাদতে মসগুল হয়েছিলেন, সেই গৃহে আজও কেউ জুতো পায়ে প্রবেশ করেনা। তাই বলছিলাম—আজকের লেখক/ ঐতিহাসিকরা কি আওরঙ্গজেব শুধু হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, তাঁর গোঁড়ামীর জন্যই মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল এই সবই লেখে যাবেন আর তাঁর সহস্র মহান মহানুভবতার পরিচয়গুলো লেখতে কি তাঁদের কলম অকেজো হয়ে গেছে ?

ভাবতে অবাক লাগে যে আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামিটা ছিল কোথায় ! মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি দায়ী হবেনই বা কেন। ঈশ্বরকে ভাল বেশে, স্বধর্মে সৎপথে বিশ্বাস রেখে, আর্ত-নিপীড়িতের দুঃখ-কষ্টে জীবন উৎসর্গ করাটাই কি হিন্দু বিদ্বেষ আর গোঁড়ামি ? আর যদি তাই হত তাহলে তিনি একটানা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে রাজত্ব করলেনই বা কেমন করে ? কোন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিই এটা মানতে পারেন না যে একজন মহান মহানুভব সম্রাটের মতি গতির ঠিক ছিল না। আর এও ঠিক যে তিনি যদি অন্যায় অত্যাচার অবিচার চালিয়ে রাজ্য শাসন করতেন তাহলে ঈশ্বরের মানদণ্ডে তিনি কখনই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সম্রাট হয়ে থাকতে পারতেন না। কেননা ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ড বড়ই পাক পবিত্র—বড়ই সহজ, বড়ই কঠিন, বড়ই নির্মম। আর একথাও ঠিক যে

আল্লার এবাদতে আর রাজ্য শাসন করে করে তো তিনি বৃদ্ধ হয়ে কুঁজো অবস্থায় পরলোকগমন করলেন। আরও কি দেশ শাসন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল ? অতএব নানা সুযোগে নানা বিদ্রোহীরা মেতে উঠেছিল চারদিক। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত।

যাই হোক আরো কিছু লেখক/ঐতিহাসিকদের কুকীর্তির নমুনা রাখা যাক। আশ্চর্য্যের কথা যে, যে সম্রাট শাহজাহান ২১ কোটি টাকা ব্যয় করে দীর্ঘ ২১ বছরে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সমাধির উপর বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহল তৈরী করান, সেটি আজ অনেক নবীন লেখকদের মতে নাকি সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত নয়—ওটা ছিল সম্রাট অশোকের রাজপ্রাসাদ। বলুন—কে কাকে বাধা দেয়, কে কাকে মানা করে, বেপরোয়া যুগ যে যা পারো লেখে চলো—

ধন্য লেখক/ঐতিহাসিক দীক্ষিত দেশোয়ালী
ধন্য তোমাদের বিকৃত অবাধ্য কলম-কালি !

প্রিয় পাঠকগণ ! আশা করি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে আমাদের ভারতবর্ষে এমনি অনেক ব্যবসায়ী লেখক ঐতিহাসিক ছিলেন বা আছেন, যাঁরা অর্থ লোভে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে সিদ্ধ হস্ত। তাই আলোচনা দীর্ঘ না করে এখন আসা যাক সিরাজের মৃত্যুর ব্যাপারে, দেখা যাক দানশাহ কতখানি দায়ী।

সেদিন কুখ্যাত জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর প্রভৃতি নিজ নিজ ভাগ্য গণনা করাচ্ছিলেন শেঠের আঙিনায়। আর সেদিনের হস্তরেখা বিচারের পাণ্ডা ছিল বিদেশী বেনিয়া (বণিক) কুখ্যাত ওয়াট্স, ক্লাইভ প্রভৃতি। পাণ্ডারা সকলের হাত দেখে বলেছিল মীরজাফরকে –তুমিই হবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি। শুনেই ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর মনের আনন্দে নেচে উঠেছিলেন মনে মনে। আর সেই সাথে স্বার্থান্বেষী জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি ইয়ারগণও মনের আনন্দে নিজ নিজ ভাগ্য বণ্টনের স্বপ্ন দেখে ছিলেন পলকে পলকে। সেদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল জগৎ শেঠের বাড়ীর গোপন বৈঠকখানা।

সিরাজের পরাজয়….আর দানশাহ ?

কাশিম বাজার কুঠির কথাও কেউ আজ ভুলে যায়নি। ঐ দুষ্কৃতকারী-দের কাছে নবাব কম কাকুতি মিনতি করেননি। তিনি বলেন—এ দেশ আপনাদের। আপনারা আমায় অযোগ্য ভাবলে আমার পরিবর্তে সিংহাসনে আর কেউ বসুন, কিন্তু দোহাই আপনাদের এই দেশ ঐ বিদেশীদের হাতে তুলে দেবেন না।

কিন্তু কুখ্যাত বেইমান মীরজাফর সেদিন কোরাণ স্পর্শ করে বলেছিল—নবাবের পরম হিতৈষী হয়ে নবাবের দায়িত্ব পালন করে যাবে। আর অন্যান্য ভণ্ড-বেইমানরাও নবাবের কাছে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে শপথ করেছিল তা আজও আমরা ভুলে যাইনি।

অথচ মজাটা দেখুন কার্য্যক্ষেত্রে। পলাশীর প্রান্তরে কুখ্যাত ক্লাইভের পরিকল্পিত খঞ্জরে বাঙালীর রক্তে লালে লাল হয়ে যেতে লাগল পলাশীর মাঠ। ইংরেজরা বেপরোয়াভাবে দাগতে লাগল গোলা বারুদ কামান। আর মহামান্য সেনাপতি মীরজাফর সৈন্য সামন্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন পলাশীর মাঠে আতসবাজির খেলা। একটিবারও হুকুম দিলেন না গোলা বারুদ কামান দাগতে। যেখানে ক্লাইভের সৈন্য মাত্র তিন হাজার দু'শো আর সিরাজের সৈন্য পঞ্চাশ হাজার থাকা সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত হতে হয়—এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পলাশীর যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিলনা, এটা ছিল বেইমান জগৎশেঠ, মীরজাফর প্রভৃতির আগে থেকেই রিহার্সাল দেওয়া একটি রঙ্গমঞ্চ। আর সেই মঞ্চের নেপথ্যে ঘসেটি বেগমের চালটিও ছিল দারুণ। আর তা না হলে বিশেষ করে জগৎ শেঠের পরিকল্পিত প্রশস্ত জাল পাতানো বাসনা যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেত।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শোষক জগৎশেঠ খুব ভালভাবে জানতো যে নবাব সিরাজদ্দৌলা যতদিন বাংলার নবাব হয়ে থাকবেন—ততদিন শেঠের পক্ষে দেশ শোষণ করে দেশব্যাপী ভুঁড়ি প্রশস্ত করা ভীষণ অসুবিধা হবে, তাই যত শীঘ্রই নবাবকে দুনিয়ার বুক থেকে সরানোই হবে শ্রেয়। ফলে পলাশীর যুদ্ধে শেঠ, জাফর প্রভৃতি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল খেলার যুদ্ধই প্রাণ

ভরে উপলব্ধি করলেন—নাম মাত্র যুদ্ধ হল আর প্রাণ দিল দেশ মাতার বেশ কিছু বীর বরণ্য সন্তানরা।

ফলে পরাজিত নবাব পুনঃ শক্তি সংগ্রহে পুর্ণিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে গোপনে ত্যাগ করলেন মুর্শিদাবাদ। কিন্তু পথে ধরা পড়ে বন্দী অবস্থায় ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদের কারাগারে। আর অতর্কিতে নবাবকে ছোরা মারল মহাম্মদি বেগ, শেষে প্রাণ হারালেন নবাব, ভেসে গেল পলাশীর শোক-সিন্ধুতে ভারতবাসীর ভাগ্যসূর্য্য—নিভে গেল নবাবের অমূল্য প্রাণ-প্রদীপ। মোট কথা বেইমানী করল বেইমানদের দল আর বদনামের বোঝা চাপলো সাহাপুর/বাহারালের হজরত পীর দানশাহ (রাঃ) এর উপর। বিচিত্র মানুষ—বিচিত্র মানুষের স্বার্থপরতা।

প্রিয় পাঠকগণ! সিরাজের মৃত্যুর ব্যাপারে কয়েকটি মর্মান্তিক দৃশ্যের নমুনা উপলব্ধি করুন! সিরাজ বন্দী অবস্থায় ফিরে এসেছেন মুর্শিদাবাদ কারাগারে। তাঁর চোখের সামনে ভাসছে কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাগ্যলেখা। মনের মাঝে ভেসে উঠছে প্রিয় নানার অমূল্য উপদেশগুলো। চোখের জল বিন্দুতে ঝরে পড়ছে একে একে আত্মীয়-স্বজনদের স্মৃতিকথা। কোথায় প্রিয়তমা বেগম লুৎফা! কোথায় মা জননী আমিনা! কোথায় আত্মীয় স্বজন! কে হবে এই মুহূর্তে সাহায্যকারী! কে অতর্কিতে এসে উদ্ধার করবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি নবাব সিরাজদ্দৌলাকে! কেউ নেই। না না, তা কেন হবে। ঐ তো অতর্কিতে একজন প্রবেশ করল কারাগারে। কে! কে তুমি? মহম্মদী বেগ! এসো! এসো বন্ধু! কিন্তু না, মহম্মদী বেগ নীরব।

নীরব হওয়ারই কথা। কারণ তার হাতে ঝলমল করছে তখন সুতীক্ষ্ম তরবারী। নবাব মৃত্যুর সংকেত বুঝতে পেরে বড় করুণ সুরে বললেন—'মহম্মদী বেগ! শেষে তুমিই আমায় কতল করতে এসেছো?' মহম্মদী বেগ নিশ্চুপ। নবাব কাতর কণ্ঠে আবার বললেন—'তোমরা কি আমায় একটা ভিক্ষুকের মতও বেঁচে থাকতে দেবেনা!' মহম্মদী বেগ কটাক্ষ দৃষ্টিতে বলল—'না'।

নবাব চারদিক একবার তাকিয়ে চোখের জল মুছে বললেন—ভাই!

সিরাজের পরাজয়...আর দানশাহ ?

তাহলে একটিবার সুযোগ দাও! আল্লার কাছে যাবার পূর্বে দুই রাকাত শেষ নমাজ পড়ে যাই!

নবাব নমাজ শেষে রত হলেন প্রার্থনায়। বাইরে বেইমানদের ইঙ্গিতে বেজে উঠল বাঁশির সংকেত। আর তখনি প্রার্থনারত নবাবের উপর চলল তরবারীর পর তরবারীর আঘাত। লুটিয়ে পড়ল নবাবের মহামূল্য দেহখানা। আশা পূর্ণ হল ষড়যন্ত্রকারী বেইমানদের।

আসুন! এখানে একটি প্রসঙ্গ টেনে বিশ্বাসঘাতকদের কুকীর্তির কয়েকটি নমুনা রাখছি। আপনারা বিশ্বনবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর নাতী হজরত এমাম হোসেন (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনদের উপর কুখ্যাত কারবালা প্রান্তরের মর্মান্তিক ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে হজরত এমাম হোসেন (রাঃ) সপরিবারে কারবালা প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন। এবং বেইমান কাফেররা তিলে তিলে নানারূপ দুঃখ কষ্ট দিয়ে একে একে সহিদ করে হোসেনের আপনজনকে। শেষে ফোরাত কুলে তৃষ্ণার্ত অসহায় হোসেনের বুকে উঠে কুখ্যাত সীমার লাইন হোসেনের দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে, হজরত এমাম হোসেন (রাঃ) বলেন—ভাই! বুক থেকে নামো শেষবারের মত দুই রাকাত নমাজ পড়তে দাও! তীরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হোসেন (রাঃ) কোন রকমে উঠে নমাজে ধ্যান দিলে কুখ্যাত সীমার তাঁর দেহ থেকে মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে মহানন্দে বল্লমের ডগায় গেঁথে নিয়ে আনন্দের মিছিল করে চারদিক। আর তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত নারীদের বন্দী করে নিয়ে যায় দামেস্ক শহর। কারাগারে কী আর্তনাদ। পিতার শোকে চার বছরের মেয়ে ফাতেমা কেঁদে কেঁদে মৃতপ্রায়। কুখ্যাত দামেস্করাজ এজিদের ইঙ্গিতে জনৈক সিপাহী এক বাসনে রুমাল ঢেকে নিয়ে আসে ফাতেমার কাছে। বলে, ফাতেমা কান্না বন্ধ কর। ক্ষুধার জ্বালায় তোমার কান্না দেখে এজিদ পাঠিয়েছেন মদিনার খোরমা। নাও—প্রাণভরে খাও।

চার বছরের ফাতেমা আগ্রহভরে যেমনি রুমাল খুলে, দেখতে পায়

পিতার কাটা মাথা। ভীষণ আর্তচীৎকার করে লুটিয়ে পড়ল ফাতেমা। সমস্ত কারাগার জুড়ে নেমে এল কান্নার উপরে আরো শোকের মাতম ! এমাম হোসেনের কাটা মাথার পবিত্র মুখ দিয়ে যেন বের হচ্ছিল—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নানার উম্মতের জন্য কোরবান হয়েছি—তোমরা মাতম বন্ধ করো !

প্রিয় পাঠকগণ, এখানে কারবালা প্রান্তরের মর্মান্তিক দৃশ্যটি টানা হল এই কারণে যে, পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধক্ষেত্রের পর একটি মর্মান্তিক দৃশ্য এমনি আছে, যা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। আপনারা কেউ যেন না ভাবেন—এখানে নবী বংশের সাথে নবাব আলিবর্দীর বংশ গৌরব নবাব সিরাজদৌলা ও তাঁর পরিবার বর্গের তুলনা করছি। আমার অসাবধানতার জন্য যদি কোথাও তুলনামূলক আলোচনা হয়ে যায় তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে ক্ষমা তো চেয়ে নিচ্ছিই সেই সাথে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছেও। এখানে উপমা রাখার কারণই হচ্ছে—কারবালায় হজরত এমাম হোসেন (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনদের উপর কাফেররা যে অন্যায় ভাবে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে কাফেরের ভূমিকা পালন করেছে ঠিক অনুরূপ না হলেও সিরাজের আমলে বিশ্বাসঘাতকের দল বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন করে তারা যে কিরূপভাবে তাদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তার কিছু নমুনা দেখুন !

সিরাজকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর মৃতদেহকে একটি বস্তায় ভরে হাতীর পিঠে চড়িয়ে আনন্দে বেশ কিছু পথ পরিক্রমা করানো হয়েছে। সিরাজের মা ও বেগম লুৎফা এবং আরো অনেকে তখন কারাগারে বন্দিনী। তাঁরা আলিবর্দীর বিখ্যাত শৌখিন বাগানের আম খেতে চান কি না কারাগারে এই কথা তাঁদের জিজ্ঞেস করা হলে জনৈকা মহিলা অশ্রুভরা চোখে ইঙ্গিতে সম্মতি জানান। পরে বেইমানরা অর্দ্ধভর্তি আমের বস্তা পৌঁছে দেয় কারাগারে। একজন মহিলা বস্তার মুখ খুলতেই দেখতে পান বস্তায় আম বা অন্য কোন বস্তু নেই—আছে শুধু সিরাজের বীভৎস কাটা মাথা। সিরাজের মা পুত্র শোকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মুহূর্তে।

আর একদিকে অজ্ঞান হয়ে স্বামী শোকে লুটিয়ে পড়লেন লুৎফা। সিরাজের কাটা মুণ্ড যেন মা ও তাঁর পিয়তমা পত্নীর দিকে চেয়ে অতি করুণ সুরে বলছিল—মা গো! বড় তৃষ্ণা! লুৎফা. ভারতবাসী সবাই শান্তিতে আছে তো! সাবধান! দেশ যেন বিদেশীর হাতে না যায়!

পরে জয়নাল আবেদিন নামে এক দরিদ্র ব্যক্তির অনুরোধে খোসবাগে নানা আলিবর্দীর কবরের পাশে সিরাজের খণ্ডিত দেহকে সমাধীস্থ করা হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে জগৎশেঠের গোপন কাণ্ড-কারখানা এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে কি দানশাহও লিপ্ত ছিলেন? আসুন! দানশাহ বিশ্বাসঘাতক কি না সে কথায় আসছি পরে। এখন আর একটু উপলব্ধি করুন—অনেকের মতে সিরাজ নাকি নারী নিয়ে রাজত্ব করতেন।

সিরাজকে কলঙ্কিত করার ব্যাপারে কেউ বা বলেন—সিরাজ নদীবাক্ষে আরোহীশুদ্ধ নৌকা উল্টে দিয়ে যুবক-যুবতী, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি সাঁতার না জানা শিশুদের জলে নিমজ্জিত হওয়ার দৃশ্য দেখে আনন্দে হো হো করে হাসতেন। কেউবা বলেন—জীবন্ত গর্ভবতী নারীর পেট চিরে পেটের বাচ্চা দেখতেন। কেউবা আবার বলেন, যৌবনের উন্মাদনায় সুন্দরী সুন্দরী নারী নিয়ে রাজত্ব করতেন ইত্যাদি এই ধরণের আজগুবী অনেক কলঙ্ক ঐতিহাসিকরা ধার্মিক সিরাজের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, দেশবাসী হয়ে দেশবাসীর উপর বজ্রপাত করছেন, এর যে পরিণতিটাই বা কি হবে, কোথায় কোন বৃক্ষের ছায়াতলে তাঁরা দাঁড়াবেন আর সেই বৃক্ষছায়া স্নিগ্ধ-শীতল হবেনা বিষবৃক্ষ ছায়ায় পরিণত হবে; এসবের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই ছিলনা, ছিল শুধু আবোল তাবোল রচনা করে মোটা অঙ্কের বাক্স বোঝাই করার স্পৃহা।

প্রথমে বিচার করা যাক সিরাজের বয়সটাকে নিয়ে। সামাজিক দৃষ্টিতে একজন যুবক কতখানি সংযমী হতে পারে, তার দৈহিক চেতনা বিশেষ করে নারীর আকর্ষণ কতখানি থাকতে পারে—তা, যাঁরা সিরাজকে নারী নিয়ে রাজত্ব করতে দেখেছেন তাঁরাই ভালভাবে উপলব্ধি করবেন।

উপলব্ধি করবেন নিজেদের যৌবনকালটাকে নিয়ে। তাঁরা যৌবনে নব নব রূপসী যুবতীর প্রতি কখনো আকৃষ্ট হয়েছেন কি না যদি হয়েছেন কেন হয়েছেন—নাকি বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে ঋষি মনীষীতে পরিণত হয়েছিলেন। যদি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় আর তা না হলে নিজকে সাধু না সেজে অন্যকে উপদেশ কিংবা দোষ দেওয়া যে কতখানি অন্যায়—যা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই ক্ষমা করতে পারেন না।

সাধারণতঃ বাল্যকালে আর দশ জনের চরিত্রে যা দোষ থাকে তা হয়তো সিরাজেরও থাকতে পারে। আর এ কথাও ঠিক যে কেউ যদি তাঁর রূপবতী কন্যাকে সাজিয়ে গোজিয়ে সিরাজকে জামাইরূপে পাওয়ার লোভে যেখানে সেখানে নিজ নিজ রূপসী কন্যার রূপ দেখিয়ে পথিককে বশীভূত করার কৌশল আঁটেন, তাহলে সিরাজ খুব দোষী কি ? বাগানে রাশি রাশি গোলাপ, চামেলী, যুঁই, রজনীগন্ধা প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে থাকলে ভ্রমর তো নির্বিবাদে ফুলে ফুলে বসে তার বোসা (চুমো) নেবেই। ভ্রমরের দোষ কোথায় ? কিন্তু কথা হচ্ছে সিরাজের এই চারিত্রিক দোষ আদৌ ছিল কি না তাও ভেবে দেখা উচিত। কারণ সিরাজ বাল্যকাল থেকেই নানা ও তাঁর মায়ের প্রভাবে পলে পলে মানুষ হওয়ার উপদেশ পেয়েছেন। যার ফলে তিনি হতে পেরেছিলেন ধার্মিক এবং জীবনে পেয়েছিলেন বিখ্যাত পীর হজরত দানশাহ (রাঃ) কে।

যুগে যুগে কালে কালে লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন মানুষ যখন সুপথে পরিচালিত হয়ে কোন সুকাজে অগ্রসর হয়—শয়তান তখন লেগে পড়ে তার পিছে। আর সে জয়ী হলে তার পরিচালিত মানুষ দ্বারা কুৎসা রটায় ঐ মহান ব্যক্তিটির। তাই এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়—সিরাজের শোচনীয় পরাজয় ঘটলে তাঁর মৃত্যুর পর ভয়ে কেঁপে উঠেছিল বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের বুক। পিছে ভারতবাসী ক্ষিপ্ত হতে পারে তাই কিছু দালাল লেখক/ঐতিহাসিকদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল সিরাজের প্রতি কুৎসা রটিয়ে দিতে। তাই তাঁরা নির্বিবাদে লেখে চললেন যার যা ইচ্ছা। শুধু সিরাজেরই প্রতি নয়—পলাশী যুদ্ধের আগেও লেখলেন পরেও

লেখলেন, এখনো লেখে চলেছেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে আকবর বাদশাহকে যাঁরা উপাধি দিলেন মহামতি, দিল্লীশ্বর, তাঁরাই মারলেন তাঁরই দাড়িতে ঝাড়ু। বলুন সবাই—বলিহারী ভাই বলিহারী! যে সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দু মন্দিরের সেবার্থে শত শত বিঘা দান করলেন নাখ্‌রাজ সম্পত্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন 'আলমগীর' গ্রাম। প্রসঙ্গত আরো অবাক লাগে যে যাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু—সেই আওরঙ্গজেব হলেন হিন্দু-বিদ্বেষী। হিন্দু-মুসলিম সবাই বলুন—বলিহারী ভাই বলিহারী। যে নবাব সিরাজদৌলা জীবনে পেয়েছিলেন বিখ্যাত হিন্দু-মুসলিম সকল জাতির পীর হজরত দানশাহ (রহঃ) কে, সেই পীর হলেন প্রিয় শিষ্যের পরম শত্রু আর সেই মহান পীরের প্রিয় শিষ্য ধার্মিক দেশপ্রেমিক সিরাজ হলেন নারী লোভী, লম্পট, কুলাঙ্গার। হিন্দু-মুসলিম সবাই বলুন—বলিহারী ভাই বলিহারী!!

সুধী পাঠকবৃন্দ! বাজারে দালাল লেখকদের 'দুর্গন্ধমার্কা' ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে কেঃজিঃ খানেকের গ্রন্থ লেখা যাবে। আলোচনার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই এই ক্ষুদ্রাকারের গ্রন্থ পৃষ্ঠায়। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে আসা যাক অন্য দিকে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের এজলাসে দানশাহ

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে সিরাজের ধরাধরির ব্যাপার বিভিন্নরূপে পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত নবাব গোপনে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে দানশাহ ফকিরের গৃহে আশ্রয় নিলে, এই দানশাহ ফকিরই নবাবকে ধরিয়ে দেন।

সবাই জানেন যে, নবাব যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পুনঃ শক্তি সংগ্রহের জন্য পাড়ি জমিয়ে ছিলেন পূর্ণিয়া-পাটনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভাগ্যচক্র উল্টো দিকে নিয়ে গেল নবাবকে। ফলে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত নবাব ধরা পড়লেন পথে, ব্যর্থ হল নবাবের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা।

নবাবের ধরাধরির ব্যাপারে মাথা ঘামালে প্রথমতঃ আমাদের জানতে হবে বেশ কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা। জানতে হবে ঐতিহাসিকদের শ্রেণী বিন্যাস অর্থাৎ তাঁরা নিরপেক্ষ না 'জিত মামা তোর দিক'। কারণ, ঐতিহাসিকের এজলাসেই হোক আর যে কোনও বিচারের এজলাসেই হোক বিচারককে সর্বদাই নিরপেক্ষতা বজায় রেখেই বিচার করতে হবে। বিচারের কাঠগড়ায় আসামীকে দাঁড় করিয়ে প্রমাণসহ নির্দোষ-ভাবে তাকে খালাস করা এবং প্রমাণসহ দণ্ড দেওয়াই বিচারকের মহান কর্তব্য। তাই এক্ষেত্রেও বিচার করবেন সত্যিকারের ঐতিহাসিকরা আর বিচার করবেন সুধী পাঠকবর্গরা। নিম্নে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নাট্যকারদের বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করছি। আমার বিশ্বাস যে, সিরাজের ধরাধরির ব্যাপারে জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন— কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক।

প্রথমতঃ আসা যাক গ্রামোফোন রেকর্ডে যা আজও আমরা নাটক শুনি। সিরাজের ধরাধরির ব্যাপারে কয়েকটি লক্ষ্যণীয় ডায়ালগ্‌ রয়েছে। নাট্যকারের কলমে দেখা যায়—পলাশী যুদ্ধের পর পরাজিত নবাব এবং বেগম লুৎফাকে নিয়ে উদাসী গাঙের উদাসী মাঝি উদাসী গান গেয়ে পাড়ি জমিয়েছে—

একুল ভাঙে ওকুল গড়ে
এই তো নদীর খেলা
সকাল বেলা আমীররে ভাই
ফকির সন্ধ্যা বেলা
এই তো নদীর খেলা····।

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন! গান শেষে নবাবকে উদ্দেশ্য করে মাঝি বলছে, 'হুজুর নাউ কি সামনের বাঁকে বাঁধবো ?'

—কেন ?

— সামনেই ভগবানগোলা, সারাদিন পেটে দানা পানি পড়েনি·······

আর ঠিক এই মুহূর্তেই বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের দল এসেই ধরে ফেলল নবাবকে। ফলে নাট্যকার শচীন সেন গুপ্ত মহাশয়ের মতে ভগবানগোলা থেকেই বন্দী অবস্থায় নবাবকে ফিরে যেতে হল মুর্শিদাবাদের কারাগারে।

নাট্যকার আবার কারাগারের দৃশ্যে বন্দী নবাবকে উদ্দেশ্য করে কয়েক-জন কারারক্ষীর দ্বারা উপহাসমূলক ডায়্যালগ্ প্রয়োগ করিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি ডায়্যালগ্ বেশ লক্ষ্যণীয়। ডায়্যালগ্‌টি এই যে, নবাবকে উপহাস করে একজন বলছে– 'ইনি ফকিরের দরগাহে খিচুড়ি খেতে পান নি।' তবে নাট্যকার কোন ফকিরের দরগাহের কথা তুলেছেন তার কিন্তু কোন উল্লেখ নেই। তবে যদি নবাবের পীর দানশাহ ফকিরের দরগাহের কথা উল্লেখ করে থাকেন তাহলে একটু চিন্তার বিষয় যে, পলায়ন কালে নবাব যদি ভগবানগোলায় ধরাই পড়ে যান, তাহলে এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ করে যে যুগে দ্রুত যানবাহনের অত্যন্ত অসুবিধা আর যেখানে নবাব একা নন, সঙ্গে আছেন বেগম লুৎফা। যেখানে আঁকে বাঁকে নদীপথ ছাড়া নবাবের আর কোন পথই ছিল না। আরও বিপদ ছিল যে, নবাবকে পালাতে হচ্ছে অতি গোপনীয়তার মাঝে। তাহলে পাঠকগণ চিন্তা করুন ভগবানগোলা থেকে মালদহ জেলার অন্তর্গত সাহাপুর/বাহারালের দানশাহ ফকিরের দরগাহের দূরত্ব কতখানি! এই অল্প সময়ে নদীপথে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নবাব পীরের দরগাহে এলেনই বা কি করে আর খিচুড়ি না খেয়েই

ভগবানগোলায় আবার পৌঁছুলেনই বা কি করে, চিন্তনীয়। এখানে আমরা একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নবাবের জন্য যখন ফকিরের দরগাহে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল এবং নবাব যখন এই রান্না করা খিচুড়ি খেয়ে যেতেও পারেননি তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে নবাব নিশ্চয়ই পীরের দরগাহে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং ধরা পড়ার ভয়ে নবাব পুনরায় মাঝিকে নিয়ে নদীপথে যাত্রা করে ভগবানগোলায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেই শত্রুদের হাতে ধরা পড়েন। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে নবাব যদি দানশাহ ফকিরের গৃহে ধরা পড়ে থাকেন তাহলে উক্ত নাট্যকারের ভগবান গোলায় নবাবের ধরাধরির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল নয় কি ? কিংবা নবাব যদি ভগবানগোলায় ধরা পড়ে থাকেন তাহলে অন্যান্য ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত ভুল।

যাই হোক রেকর্ডে সিরাজদৌলা নাটকে নাট্যকার কিন্তু হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) কে দোষী করেন নি। তিনি যে নবাবকে ধরিয়ে দেন এ সবের কোন উল্লেখ নেই, এমন কি দানশাহর নাম পর্যন্তও কোথাও উল্লেখ করেননি। শুধু 'ফকিরের দরগাহ' বলেই কলম ক্ষান্ত করেছেন, এর জন্য নাট্যকার আমাদের কাছে শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়েছেন এবং সত্যিকারের যারা দোষী—সেই বেইমান বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর, মোহাম্মদী বেগ প্রভৃতিকে নাট্যকারের ন্যায় নিক্তিতে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকদের দলে, দলভুক্ত করে তিনি আমাদের কাছ থেকে আরো শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছেন।

তারপর আসা যাক অন্য দিকে। দিকটা আর অন্য কিছু নয়। তা হচ্ছে—আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, নবাব ধরা পড়েছিলেন মালদহ জেলার অন্তর্গত রতুয়া, কাহালা পেরিয়ে বর্তমান 'শূয়োরমারা' ঘাট নামক জায়গায়। অনেকের মুখে এবং অনেকের লেখনীতে দেখতে পাই উক্ত ঘাটের নাম শূয়োরমারা ছিল না, ছিল 'সুবামারা ঘাট'। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারকে এখানেই মারা হয়েছিল তাই 'সুবামারা' থেকে বিকৃত হয়ে ওটা লোকমুখে 'শূয়োরমারা' ঘাটে পরিণত হয়ে গেছে।

এই প্রচলিত প্রবাদটি কতখানি সত্য তা একটু খুঁজিয়ে দেখলে মালদহের প্রচীন ভৌগোলিক বিবরণের মানচিত্রে এমনি মারা মারী নামের অন্ত নেই। যেমন—সাতমারা, শূয়োরমারা, শূয়োরজল, শূয়োরখদ্দা, গিদারমারী, বিলাইমারী, রেহুমারী, কাৎলামারী, মিরকামারী, শোলমারী, বাচামারী ঝিংঞামারী, ভেদামারী, ছারামারী, হাতীমারী, কাগমারী, ভাতারমারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে—এইসব নামও কি সব বিকৃত হয়ে হয়ে নামকরণ হয়েছিল ? আসলে এখানে স্পষ্ট যে, কোন কোন জায়গায় রুই, মিরকা, কাৎলা প্রভৃতির প্রচুর আমদানি হত তাই তাদের নাম হয়ে গিয়েছিল রেহুমারী, মিরকামারী, কাৎলামারী। আবার কোন জায়গায় হয়তো কোন দুঃশ্চরিত্রা নারী তার ভাতার (স্বামী) কে মেরে ছিল তাই তার নাম হয়েছিল ভাতারমারী। তেমনি হয়তো এক জায়গায় কোন এক দুর্দান্ত শূয়োর থাকতো, মানুষের অসুবিধে সৃষ্টি করতো এবং কোন তীরন্দাজ কিংবা কোন সাহসী বল্লমধারী ঐ শূয়োরটাকে মেরে ছিল তাই তার নাম হয়ে গিয়েছিল শূয়োরমারা। আর যদি সুবাকে মেরে প্রথমে নাম হয়েছিল 'সুবামারা' তাহলে সুবামারার আগে ঐ ঘাটের নাম কি ছিল ? আসলে এসব কিছু না। আমার তো মনে হয় আগা গোড়াই শূয়োরমারা ঘাটই ছিল।

যাই হোক, এখন দেখা যাক সিরাজের মৃত্যুর ব্যাপারে মুর্শিদাবাদের জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কে কি বলেন।

মুর্শিদাবাদ গাইড এই পুস্তিকাটি রচনা করেন প্রভাত কুমার মজুমদার, প্রকাশিকা—লতিকা বিশ্বাস। কোন্ সালের কোন্ তারিখে পুস্তিকাটি প্রকাশ পায় সেসব কিছু উল্লেখ নেই। তবে পুস্তিকাটি ৭/৮ বছর আগে সংগ্রহ করা হয়েছে। যাই হোক পুস্তিকায় প্রভাত বাবু কি বলেন এখন সেটাই দেখা যাক। তিনি বলেন, "....খোসবাগে নবাব আলিবর্দী, সিরাজ, লুৎফা ও সিরাজের পরিবারবর্গের সমাধি রহিয়াছে। তাছাড়া সাহ্‌দান (দানশা ফকির) নামে আরো এক ফকিরের সমাধি উল্লেখযোগ্য। যে ফকির পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ হইতে যখন লুৎফা ও একজন বিশ্বস্ত সহচরসহ নবাব "মনসুর" উল মুলক্ সিরাজদৌলা শাহকুলী খাঁ

মীর্জা মোহাম্মদ হোয়াবত জঙ্গ বাহাদুর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পলাইতেছিলেন তখন মীর কাশেম ও দাউদকে দিয়া রাজমহলের নিকট ধরাইয়া দেন।"

তারপর মুর্শিদাবাদেরই আর এক পুস্তিকা "মুর্শিদাবাদ পরিচয়" ঐতিহাসিক গাইড—এর লেখিকা সুপ্রভা চক্রবর্তী, প্রকাশিকা উক্ত লতিকা বিশ্বাস। এই পুস্তিকাটিও যে কোন্ সালের কোন্ তারিখে প্রকাশ পায় সেসব উল্লেখ নেই। তবে পুস্তিকাটি সম্ভবতঃ ৬/৭ বছর আগে সংগ্রহ করা হয়েছে। যাই হোক সুপ্রভা চক্রবর্তী কী বলেন, এখন সেটাই দেখা যাক। তিনি বলেন, "১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ২৩শে জুন পলাশী প্রান্তরে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে সিরাজদৌলা পরাজিত হন। সৈন্যদল প্রচুর থাকা সত্বেও কুচক্রীদের চক্রান্তে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। পলায়ন কালে ভগবানগোলায় তিনি বন্দী হন এবং জাফরাগঞ্জে বন্দী অবস্থায় মহম্মদী বেগ তাহাকে হত্যা করে। ....মীরজাফর নবাব আলিবর্দী খাঁর ভগ্নিপতি এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতির সঙ্গে ইনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অবশেষে লর্ড ক্লাইভের নিকট হইতে নবাবী প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাইয়া ইনি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন।"

এ তো গেল মুর্শিদাবাদের লেখক লেখিকার বিবরণ। কিন্তু এখন দেখা যাক এ ব্যাপারে আমাদের মালদহের লোকেরা কী বলেন!

"মালদহ প্রদর্শিকা" লেখক—ফণীপাল। প্রকাশক—লোক সংস্কৃতি পরিষদ, মালদহ। প্রকাশকাল—মহালয়া ১৩৮২ সাল। পাল মহাশয় তাঁর প্রদর্শিকার ৩২ পৃষ্ঠায় 'বাহারাল' গ্রামের ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে গিয়েই বলেন, 'বাহারাল' কালিন্দ্রী নদীর তীরে একটি ছোট্ট গ্রাম। ইহা ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় ২১ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং রতুয়া থানা থেকে দু'মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত পূর্ণিয়াগামী নবাব সিরাজদৌল্লা এখানে দানশাহ ফকিরের দ্বারা ধৃত হন। শোনা যায় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত নবাব খাওয়া ও বিশ্রামের

জন্য দানাশাহর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলে দানাশাহ তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোপনে সংবাদ দিয়ে মীর কাশেমের হাতে নবাবকে ধরিয়ে দেন। এখনো বাহারাল গ্রামের তালবনা পাড়ায় দানাশাহর কবর দেখতে পাওয়া যায়। যে ঘাটে নবাব ধরা পড়েন তাকে 'সুবামারা ঘাট' বলে। বর্তমানে তাহা লোকমুখে 'শূয়োরমারা ঘাট' নামে পরিচিত।"

পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করুন। রেকর্ডে আর্কো নাটক শুনলে সিরাজের ধরাধরির ব্যাপারটা 'ভগবানগোলায়'। আর 'মুর্শিদাবাদ গাইড'-এ প্রভাত বাবু বলেন, 'রাজমহলের নিকট'। শুধু প্রভাত বাবু কেন এমনি অনেক বাবুই 'রাজমহলের নিকট' উল্লেখ করেছেন। আবার সুপ্রভা চক্রবর্তী বলেন, 'ভগবানগোলায়'। আর আমাদের মালদহের বর্তমান ডঃ ফণী পাল মহাশয় বলেন 'বাহারালে', আবার শূয়োরমারা ঘাটেরও উল্লেখ করেন। তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে—আমরা কোনটাকে ঠিক বলে ধরবো? ভগবানগোলা? রাজমহল? বাহারাল? নাকি শূয়োরমারা?

প্রভাত বাবু আরো বলেছেন—খোসবাগে আলিবর্দী সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতির সমাধি ক্ষেত্রেই দানশাহ ফকিরের সমাধি উল্লেখযোগ্য। তাহলে প্রভাত বাবুর মতে, যে দানশাহ সিরাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাহলে তাঁর কবর জাফরাগঞ্জে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর প্রভৃতির পাশে না হয়ে মহামান্য সিরাজের পাশে কেন? এই কৃত্রিম কবর দেওয়ার সময় কি মুর্শিদাবাদের কোন লোকেরই চোখে পড়েনি?

আবার ডঃ পাল মহাশয় বাহারালের নাম করে বলেন, 'এখানে ধৃত হন।' তাহলে ধৃত' কোথাটার অর্থ নিশ্চয়ই 'ধরা'। কিন্তু পরক্ষণে বলেন, 'সুবামারা' থেকে 'শূয়োরমারা'। তাহলে এখন ব্যাকরণের ন্যায্য নিক্তিতে ওজন করা যাক 'ধরা' আর 'মারা' অর্থাৎ ধৃত আর মৃত দুটি শব্দকে নিয়ে। পাল মহাশয়ের উক্তিটাকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে—সিরাজকে 'সুবামারা' অর্থাৎ শূয়োরমারা ঘাটেই মারা হয়েছিল, মুর্শিদাবাদে নয়। 'ধরা' আর 'মারা' কি এক শব্দ? আর এই পৃথক দুই শব্দের অর্থটাও কি এক?

পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমি আগেই মালদহের মানচিত্রে 'মারা-মারী' নামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছি। শুধু মালদহ কেন এইরূপ মারা-মারী, ডাঁড়া-ডাড়ী, সুর-পুর, ডাঙ্গা-ডাঙ্গা প্রভৃতি পৃথিবীর মানচিত্রে অন্ত নেই। সুবামারা থেকে যদি শূয়োরমারা হয়ে থাকে তাহলে মালদার ভুমিতে আর কোন্ সুবাকে খুঁড়া হয়েছিল যে, তার নাম বিকৃত হয়ে 'শূয়োরখদ্দা' হয়েছিল ? বা কোন্ সুবা সেখানকার জল খেতে ভাল ভাসতেন কিংবা সেই জলের মালিক ছিলেন যে বিকৃত হয়ে তার নাম হয়েছিল 'শূয়োরজল' ?

অস্বীকার করিনা। নাম থেকেও অনেক জায়গার নামকরণ হয়েছে আর বিকৃত হয়েও নামের রূপান্তর ঘটেছে। তবে সুবামারার সাথে শূয়োরমারা ব্যাপারটি যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ, ঘাটটির নাম যদি 'সুবাধরা' হয়ে বিকৃত অবস্থায় 'শূয়োরধরা' হত তাহলে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সাথে কিছুটা মিল পাওয়া যেত। কারণ, 'ধরা' আর মারা' শব্দটার তফাৎ জমি-আকাশ। অতএব এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ওটা আগা গোড়াই 'শূয়োরমারা ঘাট' নামেই পরিচিত ছিল।

পাল মহাশয় আরো বলেন -'বাহারাল' গ্রামের তালবোনা পাড়ায় দানাশাহর কবর দেখতে পাওয়া যায়।' আজ্ঞে না, ওটা বাহারাল গ্রামের তালবোনাপাড়া নয়, ওটা 'আলপাড়া' মৌজার তালবোনা এলাকা। বাহারাল আর আলপাড়া মৌজার দূরত্ব অনেক এবং ভিন্ন ভিন্ন মৌজা। আর তালবোনা পাড়ায় দানশাহর কবরই দেখলেন কোথায় ? পাড়াতো আলপাড়া পুকুরের পাশে গড়ে উঠেছে ইদানিং সরকারী কলোনী আর দানশাহর সমাধি তো রয়েছে পাড়া অর্থাৎ কলোনী থেকে বেশ খানিক দূর পশ্চিমে একেবারে ফাঁকা জায়গায়। দানশাহর সমাধি তালবোনা পাড়ায় দেখলেন কি করে ? যাই হোক ডক্টর বাবু আরো বলেছেন, দানশাহ তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নবাবকে ধরিয়ে দেন। তাহলে তাঁর কাছে আমরা জানতে চাই—নবাব, দানশাহর প্রতি কোন এমন অশোভনীয় আচরণ বা অপমান করেছিলেন যে, দানশাহ তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ?

আসলে এই মহাবিশ্বে কোন জিনিষই স্থায়ী নয়' রাজত্ব ? হুঁ, গান্ধীর মত মহান নেতাকে গুলি করা হল ! কেনেডিও নিস্তার পেলেন না গুলি থেকে। নিস্তার পেলেন না লিয়াকত আলী খাঁ। এমনি বাদশা কায়জল মুজিবর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রভৃতি। তারপর ইরাণ তো বিরাণ হয়েই চলেছে। তাই সেদিনও ভারতবাসীর ভাগ্য বিপর্য্যয় এসেছিল ঘনিয়ে। ঈশ্বরের লীলা-খেলা বোঝা সামান্য মানুষের আর কতখানি সাধ্য ? ভারতবাসীর উপর সেদিন সর্ব বিচারের বিচারক মহাস্রষ্টা কতখানি রুষ্ট হয়েছিলেন তার একটি উদাহরণ এখানে অনুমেয়।

পলাশীর যুদ্ধে যাওয়ার আগে লর্ড ক্লাইভ সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে পৌঁছুলেন বর্তমান পলতা নামক স্থানে বিখ্যাত কামেল হজরত শাহ জোবায়ের (রহঃ) অলীর কাছে। এসেই হজরতের কাছে মাথা নত করে বললেন - হুজুর পলাশীর যুদ্ধে চলেছি, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারি।

হজরত জোবায়ের (রহঃ) মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলেন ক্লাইভের সৈন্যদল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আশীর্বাদ করলেন ক্লাইভকে, যাও—তুমি জয়ী হবে। তারপর ক্লাইভের কিছু অগ্রসর হওয়ার পরই সেখানকার মুসলমানরা হজরতকে উদ্দেশ্য করে অবাক হয়ে বলতে লাগলেন—হুজুর এ কি করলেন আপনি ! আপনি একজন পীর হয়ে আশীর্বাদ করলেন ইংরেজকে ?

হজরত বললেন—আমি কি করবো ! যেখানে হজরত খেজের আলায়হে সাল্লাম (পয়গম্বর) জয়ের পতাকা নিয়ে ক্লাইভের সৈন্যদলের প্রথম সারিতেই এগিয়ে চলেছেন, সেখানে এই যুদ্ধে ক্লাইভের জয় অবশ্যম্ভাবী, অতএব আমার করার কিছুই নেই।

অনেকেই হয়তো বলবেন, 'পলাশীর যুদ্ধে খেজের (আঃ সাঃ) এলেন কোথেকে ?' তাহলে জেনে রাখা ভাল যে খেজের (আঃ সাঃ) আল্লাহর এত ইবাদত করেছিলেন যে, তাঁর ইবাদতের পরিবর্তে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বরস্বরূপ চেয়ে নেন তাঁর মৃত্যু যেন সাধারণ মানুষের মত না হয়, তিনি যেন রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় থাকেন এবং

সাধারণের চোখের আড়ালেই থাকাটা হবে তাঁর জীবনের মহাব্রত।

তাই আল্লাহর লীলা-খেলা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কোন এলাকার মানুষ যখন আল্লাহর অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে নানাভাবে অত্যাচারী হয়ে ওঠে, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছোরা বসাতে দ্বিধা করে না, স্বদেশের মর্য্যাদা না বুঝে তুলে দিতে চায় অপর দেশীয় লোকের হাতে, দিকে দিকে দেখা দেয় বিশ্বাসঘাতকের দল; তখনি সেই দেশের উপর নেমে আসে আল্লাহর অভিশাপ।

তাই যুগে যুগে কালে কালে দেখা গেছে যে, নুহ, ঈশা (যীশু খৃষ্ট) প্রভৃতি আরো অনেক নবীর আমলের লোকেরা অত্যাচারী অবিচারী বিশ্বাসঘাতক হয়ে নাস্তিকতার বদ্ধমূলে আবদ্ধ হয়ে করেছে নানাভাবে অত্যাচার, ব্যভিচার—তখনি ডেকেছে তারা তাদেরই সর্বনাশ। তারা তিলমাত্রও বুঝতে পারেনি যে কোন্ পথে এগিয়ে চলেছে তাদের ভাগ্যচক্র।

তাহলে এখানে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সৃষ্টি আর ধ্বংসের আড়ালেই রয়েছে কোন এক বিরাট শক্তি। যে শক্তি সর্বদা সজাগ—যুগে যুগে অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে মাঝখান থেকে ঐ যুগের পাক-পবিত্র আত্মাকে আড়ালে টেনে নিয়ে সেই এলাকায় আবার হয় নোতুনের সৃষ্টি —আবার ধ্বংস আবার সৃষ্টি—যার নিয়মের গতিধারা চলেছে যুগ যুগ অনন্তকাল। অথচ নির্বোধরা বুঝতে পারেনা কখন কেমন করে তাদের জীবন কষ্টিপাথরে চলেছে জীবন যাচাই-এর লীলাক্রম।

সবাই জানেন যে, নির্বোধরা শয়তান চক্রে আবদ্ধ হয়ে যীশু খ্রীষ্টকে চাপালো ক্রুশে। ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করল যীশুকে। অথচ তারা বুঝতেও পারল না যে কেমন করে ঈশ্বর টেনে নিলেন যীশুর পবিত্র আত্মাকে। ঈশ্বর তাঁর প্রেরিত যীশুর মহিমা দেখালেন পাপী জগৎকে যুগ যুগ অনন্তকাল।

তাই বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌলা নবী না হলেও তাঁর আমলে ভারতের কুসন্তানরা কুমন্ত্রনায় লিপ্ত হয়ে নিজের দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার যে প্রস্তুতি নিয়েছিল, তাই

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল ভারতবাসী। যার ফলে শত শত বছর ভারতবাসী পেয়েছিল বিদেশী নির্যাতণ পেয়েছিল আবুক—বিদেশী চাবুক।

যাই হোক সিরাজের মৃত্যু এবং আরো অনেক বিষয়ে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক তা বিশ্বভাণ্ডারে নামকেনা পক্ষপাতী দালাল লেখক/ ক্রতিহাসিকদের ভীড়ে একমাত্র জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বেছে নিতে পারবেন।

ঐতিহাসিক সুধীর বাবু বাংলা তথা ভারতের কল্যাণ ভাবতে গিয়ে তাঁর বুদ্ধির পাহাড় খুলে পরিচয় দিয়ে গেছেন 'অন্ধকূপ হত্যা'র ব্যাপারে। নবাব সিরাজদৌলার উপর অন্ধকূপ হত্যার একটা মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়ে ইতিহাসে নাম কিনেছেন, যা পরিষ্কার হয়ে গেছে সকলের কাছে।

তাই এই অন্ধকূপ হত্যার কুকীর্তির কারখানা দেখে বাংলার মহামান্য ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় বলেন, 'মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহারা না হয় স্বজাতির কলঙ্ক বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্ম পীড়িত হইয়া অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করিলেন তাহাদের স্বদেশীয় স্বজাতির সমসাময়িক ইংরাজ দিগের কাগজ পত্রে অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?'

শুধু তাই নয়, সিরাজকে লিখিত ইংরেজদের চরম পত্রেও কোথাও অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই আলিনগর সন্ধিরও কোন কাগজ পত্রে। অথচ সুধীর বাবু আর সাজানো ইংরেজ অনুচর মিঃ হল ওয়েল অন্ধকূপ হত্যার ব্যাপারে মিথ্যার কলঙ্কিত কাগজে বেশ নাম কিনে গেলেন। তাই ঐতিহাসিক মহামান্য অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয়, বিহারী লাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নিখিল নাথ রায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বজনপ্রিয় বীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের মনে উক্ত কুখ্যাত কলঙ্কের কথা কম বেদনা দেয়নি।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক পুস্তক পাঠ করে অত্যন্ত ক্ষোভে ও দুঃখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ইতিহাস' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণে লিখেন. 'সিরাজদৌলার রাজ্য শাসন কালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তিনি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রের 'সিরাজদৌলা' পাঠ করিতেন তবে এই ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।'

প্রিয় পাঠকগণ! তাহলে চিন্তা করুন, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় নিষ্ঠা ভাষণেও প্রমাণিত হয় যে কোন বিষয় রচনার আগে তার আদি অন্ত না জেনে. না শুনে নাম কেনার বাজারে কত লেখক/ঐতিহাসিক ইতিহাস তৈরী করে হাততালি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলেছি ইতিহাস কোনদিনই মিথ্যা হয় না, যদি হয় তাহলে সে ইতিহাস নয়—উপহাস, গাল গল্পের কাহিনী মাত্র।

তাই শাহজাহানের বিশ্ববিখ্যাত অমর কীর্তি তাজমহল যদি অশোকের রাজপ্রাসাদ হয়ে যায়। আকবরের দাড়িতে যদি ঝাঁটার বারী পড়ে। যিনি সারা জীবন কোরাণ শরীফ নকল ও টুপি সেলাই করে জীবন যাপনের পর আট শত পাঁচ টাকা সঞ্চয় করে তা থেকে তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য মাত্র চার টাকা আট আনা রেখে বাঁকি সমস্ত দীন-দরিদ্রকে দান করার জন্য উইল করে যান, আর্ত নিপীড়িতের বেদনায় কাতর হয়ে জীবনের মূল্য ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েন মৃত্যুর সম্মুখীন. ফতোয়া-এ-আলমগীর লেখে মুসলিম জগতে যিনি পান পীরের দর্জা, যাঁর যুদ্ধক্ষেত্রেও বাদ পড়েনি এক বেলার নমাজ, যিনি সারা জীবন আল্লার ইবাদতে মসগুল হয়ে কুঁজো অবস্থায় করেন পরলোকগমন—সেই মহামান্য সম্রাট জিন্দা পীর হাফিজ আওরঙ্গজেবের হাতে যদি ধরিয়ে দেওয়া হয় মদের পেয়ালা—লাথি মারানো হয় বাঁদি-দাসীকে দিয়ে তাহলে এক দানশাহ ফকিরের প্রতি যে দালালরা কটুক্তি করবেন না এ কেমন কথা! আর শুধু কি তাই—ভাবতে অবাক লাগে যে, আজকের সিনেমার পর্দাতেও হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) কে বাদ দেওয়া হয়নি। পলাতক সিরাজদৌলাকে এই দানশাহর গৃহে পাঠিয়ে কল্পিত দানশাহ সাজিয়ে পরিশ্রান্ত নবাবের

সাথে কথা-বাত্রার আদান প্রদান করিয়েছেন মাহামান্য লেখকরা।

কিন্তু সব কথার মোট কথা যে মজাটা দেখার আছে এক বিখ্যাত কারিগরের বিখ্যাত মিউজিয়ামে। যেখানে প্রবেশ করলে সমস্ত রহস্যের দ্বার উদঘাটন হয়ে দেখা দেবে চোখের কোঁণে সত্যতার সফলতার পবিত্র ছবি। প্রমাণ হবে সিরাজকে ধরিয়ে ছিলেন দানশাহ ফকির না আর কেউ। বিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিক মহামান্য বাংলার বীর সন্তান শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয়ের সেই প্রাচীন ইতিহাস 'সিরাজদৌলা' যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলেই জেনে নিতে পারবেন যে, পলাতক সিরাজকে ধরিয়ে দেওয়ার মূলে দানশাহ না অন্য কেউ। আসুন! এখন দেখা যাক শ্রদ্ধেয় অক্ষয় মৈত্র মহাশয় তাঁর ইতিহাসে কী বলেন, তার সংক্ষিপ্ত কিছু পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন— *"সিরাজদৌলা মহানন্দা স্রোত অতিক্রম করিয়া, কালিন্দীর জলপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে ছিলেন, তাঁহার নৌকা যখন বখরা বরগাল নামক পুরাতন পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। নাজিরপুরের মোহানা অতিক্রম করিতে পারিলেই বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু জলাভাবে নাজিরপুরের মোহানা শুষ্ক প্রায়; —আর নৌকা চলিল না। *(*আষাঢ়ের প্রথমে এখনও নাজিরপুরের মোহানায় নৌকা চলাচল করিতে পারেনা। Acordingly to the Riyax (P.373) Sirajudowla was cbliged to stop at Bahral as the Nazirpcre mcuth was fcund closed. — H. Beveridge. C. S. অস্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া তথায় একজন ফকিরের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। এই বর্ণনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।)

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সিরাজদৌলার সর্বনাশের সুত্রপাত হইল। তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে, তাঁহার পরাজয় বার্ত্তা এখন পর্য্যন্তও দূর দূরান্তরে নীত হয় নাই। সেই ভরসায় সিরাজদৌলা স্বয়ং নদীতীরে অবতরণ করিলেন; নাবিকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীমুখের সন্ধান লইতে লাগিল। ইত্যাবসরে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ মুসলমান মসজেদে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই মসজেদ দানশা নামক

বিখ্যাত মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির। তাহা অদ্যাপি সাহপুর নামক গ্রামে ভগ্নাবস্থায় বিরাজ করিতেছে।+

(+ মালদহ নিবাসী স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুত রাধেশ চন্দ্র শেঠ বহু ক্লেশে এই মসজেদের ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া মসজেদের কয়েকখানি কারুকার্য্য খচিত পুরাতন ইস্টক উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ বলেন—সিরাজদৌলা এই মসজেদের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন (Tarikh-i-mansuri) তিনি রাজমহলের নিকট কারারুদ্ধ হন। এই মসজেদ রাজমহলের নিকট না হউক রাজমহল হইতে বহুদূর নহে। রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে কালিন্দী তীরেই সিরাজদৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।)

মসজেদের লোকে ক্ষুদ্র পল্লীতে সিরাজদৌলার ন্যায় অতিথির নৌকা দেখিয়া বিস্ময়াবিস্ট হইয়াছিল, পরে নাবিকগণের নিকট সন্ধান লইয়া তাহারা সকল সমাচার অবগত হইল। মীর দাউদ এবং মীর কাশিমের সেনাদল নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন অর্থলোভে লোকে তাহাদিগকে সিরাজদৌলার সন্ধান বলিয়া দিল। সিরাজ ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ করিবারও অবসর পাইলেন না, সপরিবারে মীর কাশিমের হস্তে বন্দী হইলেন।

ইংরাজেরা বলেন, সিরাজদৌলা সম্পদের দিনে দানশা নামক মুসলমান ফকিরের নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, বিপদের দিনে প্রতি হিংসা পরায়ণ দানশা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। * (* Scrafton; clive's Evidence etc.)

মহাত্মা বিভারিজ্ ইহা অবিশ্বাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "এই জনশ্রুতি সত্য হইতে পারেনা; কারণ মুতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা স্বকৃতটীকায় লিখিয়া গিয়াছেন, ফকির আদৌ সিরাজদৌলাকে চিনিত না; তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মে; নাবিকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে নবাবকে ধরাইয়া দেয়"।

(+ But this can hardly be true if the translator of the sayer be correct in saying that the Fakir did not

recognize the Nowab and only learnt who he was from the boatmen, after his suspieious had been arcused by observing the richness of the stranger's slippers.—

—H. Bevridge. c. s.)।

আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসলমান ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশার স্থায় একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দানশার সমাধিমন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।

সিরাজদৌলা কালিন্দী তীরস্থ সাহপুর গ্রামে দানশাহর সমাধি মন্দিরের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বোধ হয়।

রিয়াজ—রচয়িতা শ্রীযুক্ত গোলাম হোসেন সলেমী মালদহের লোক, তাঁহার কথাই অধিকতর বিশ্বাস্য কিন্তু দানশা বা তাঁহার বংশধর দিগের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একবার হণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দানশা সিরাজদৌলাকে ধরাইয়া দিয়া মীরজাফরের নিকট হইতে বহুমূল্য জায়গীর লাভ করিয়া স্বদেশে "সুভামার" খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেই জায়গীর উপভোগ করিতেছেন।" * (*Hunter's statistical Accounts of Bengal VoL. VII. 84)

এ কথা সত্য হইলে মালদহের কালেক্টারীতে এই জায়গীরের সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু তথায় এরূপ জায়গীরের আদৌ কোন উল্লেখ নাই, মালদহের ভুতপূর্ব কালেক্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বট্ব্যাল মহাশয় সেরেস্তা তদন্ত করিয়াও তাহার সন্ধান পান নাই। †(† H. Beveridge. c. s.) দানশার অধিকারে অনেক নিষ্কর ভূমি থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সমাধি বিচ্যুত পুরাতন ইস্টক সজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে এখন অল্প কয়েক বিঘা মাত্র নিষ্কর ভূমি রহিয়াছে।"......

…(৩৪৩ পৃঃ থেকে ৩৪৫ পৃঃ পর্যন্ত—"সিরাজদ্দৌলা," অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ; একাদশ সংস্করণ, ১৩৬৫)।

আশা করি এতক্ষণে পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবকে কোন্ ফকির ধরিয়েছিলেন। দানশাহ ? শ্রদ্ধেয় অক্ষয়বাবু তাঁর স্পষ্ট কলমে লেখেছেন, "….ইত্যবসরে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ মুসলমান মসজেদে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ঐই মসজেদ দানশাহ নামক বিখ্যাত মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির।" …শুধু তাই-ই নয়, তিনি আরো লেখেছেন, …."আমরা দানশার সমাধি মন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।"

তাহলে এখন প্রশ্ন উঠে যে, হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) কি সমাধি থেকে উঠে এসে নবাবকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন ? হতে পারে, হয়তো সেই সময়ে অর্থ লোভে কোন ভিক্ষান্বেষী ভিক্ষুক কিংবা কোন অর্থলোভী এই কুকীর্তি করে থাকতে পারে। এর জন্য হজরত পীর দানশাহর নাম কোন মতেই উঠতে পারে না।

মহাত্মা বিভারিজ অবিশ্বাস করে লেখেছেন—"এই জনশ্রুতি সত্য হইতে পারেনা, কারণ মুতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা স্বকৃত টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন, ফকির আদৌ সিরাজদ্দৌলাকে চিনিত না ; তাঁহার বহুমুল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মে ; নাবিকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে নবাবকে ধরাইয়া দেয়।"

তাহলে এখন কয়েকটি সুত্রে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই ফকির সেই হজরত পীর দানশাহ ফকির নয়—এই ফকির হয়তো কোন 'দানেশ' নামীয় ফকির থাকতে পারে, পরে লোকমুখে এই অর্থলোভী দানেশ ফকিরই দানশাহ ফকির নামে পরিচিত হয়ে গেছে। আর তা না হলে সিরাজের প্রিয় পীর হজরত দানশাহ (রহঃ) তাঁর প্রিয় শিষ্য সিরাজকে চিনবেন না। কেন ?

মহামান্য অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয়-এর বিবৃতিতে স্পষ্ট বোঝা যায়—

নবাব সিরাজদৌলা যে দানশাহর সমাধি মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। তিনি যে সাহপুর মসজেদ অর্থাৎ সমাধি মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন, আজকের সাহাপুরে সেই সমাধি মন্দিরের কোন ধ্বংসাবশেষ না থাকলেও আমরা ধরে নিতে পারি যে পীরের প্রথম সমাধি মন্দির ফকির তাকিয়া অর্থাৎ বর্তমান কালুটোলার কাছে যে সমাধি ছিল তারই কথা অক্ষয় বাবু উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে সেই জায়গা-টির নাম হয়তো সাহপুর ছিল পরে কোন প্রভাবশালী কালু নামীয় লোকের নাম থেকেই সাহপুর চাপা পড়ে কালুটোলায় পরিণত হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে এই গ্রন্থের সূচনায় যে কুতুবশাহ তাবরেজীর কথা উল্লেখ করেছি সেই 'কুতুবশাহ' থেকেও উক্ত জায়গার নাম সাহপুর হয়েছিল, পরে কোন কালুমুদ্দিনের নাম থেকেই উক্ত এলাকার নাম কালুটোলা হয়ে যেতে পারে।

যাই হোক নবাব পীরের সমাধি মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। পারেনা এই কারণে যে, নবাবের নদী পথে গতিরোধ হলে তাঁর চোখে হয়তো নেমে এসেছিল বেদনার ঘনছায়া। তাই হয়তো তাঁর মনে পড়েছিল প্রিয় পীরের স্মৃতিগুলো। ভেবেছিলেন হয়তো জীবনের আর কোন আশা নেই, নেই কোন ভরসা। তাই পায়ে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন জীবনে শেষ বারের মত একবার পীরের সমাধি দর্শন করে নিতে। সমাধিতে আশ্রয় নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং পীরের কাছে কী কী প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি যে যার জীবনের একবার মৃত্যুর শেষ বাঁশি বেজে ওঠে তাকে রোধ করার ক্ষমতা স্রষ্টা ছাড়া কারুরই নয়। তাই কোন অর্থলোভী ভিক্ষান্বেষী ভিক্ষুক নবাবের সন্ধান জানিয়ে দেয় বেইমানদের আর তখনি তারা সমাধি মন্দিরেই হোক আর তার আশে পাশেই হোক কিংবা রাজমহলের কাছেই হোক নবাবকে ধরে নিয়ে চলে যায় মুর্শিদাবাদে। এখানে নবাবকে ধরার ব্যাপারে হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) র নাম কোন মতেই উঠতে পারেনা।

কেননা, শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবুর বিবৃতি আরো স্পষ্ট করে দেয়—"মালদহ

নিবাসী স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুত রাধেশ চন্দ্র শেঠ বহু ক্লেশে এই মসজেদের ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া মসজেদের কয়েকখানি কারুকার্য্যখচিত পুরাতন ইস্টক উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কারো কারো মতে দানশাহ যে সিরাজকে ধরিয়ে দেন তার উত্তরে অক্ষয়বাবু বলেন—"আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসলমান ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশাহর ন্যায় একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নাসা-কর্ণচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দানশাহর সমাধি মন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।"

সমাধি মন্দিরের কারুকার্য্যখচিত কয়েকটি ফলকলিপির কথা যে বলা হয়েছে, তাতেও পীর দানশাহর প্রথম সমাধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গ্রন্থের সুচনার মধ্যেই পীরের প্রথম ও দ্বিতীয় সমাধির কথা উল্লেখ করেছি। পাঠকরা জেনেছেন যে নদী পাড়ের ধ্বস নেমে নেমে নদী যখন সমাধির কাছাকাছি হয়েছিল তখনি দানশাহ স্বপ্ন দেন তাঁর প্রিয় ভাই আশক হোসেনকে। সমাধি খনন করা হয় এবং সিন্দুক সমেত পীরের দেহকে বহন করে আনা হয় বর্তমান তালবনা নামক জায়গায় এবং এখানেই তাঁর দ্বিতীয় সমাধি দেওয়া হয়।

যাই হোক এখানে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, মালদহ নিবাসী শ্রীযুত রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয় যে ফলকলিপি উপঢৌকন পাঠান, আমার তো মনে হয় উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ফলকলিপিগুলো পাঠিয়ে ছিলেন। যে সমাধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে আজ মানব চোখের অনেক অনেক দূরে।

ইংরেজরা? তাঁরা তো দানশাহর নামে কলঙ্ক দেবেনই। কারণ সুযোগ বুঝে নিজের দোষ এক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ রূপে মহাপুরুষ সাজা তো চালাক/চতুরের পরিচয়। তাঁরা তো বলবেনই যে পলাশীর যুদ্ধে তাঁদের কোন দোষ নেই। পলাশীর প্রান্তরে রক্ত ঝরিয়েছে ভারতবাসী আর সিরাজকে ধরিয়ে দেওয়ার কারণটাই ছিল দানশা

ফকিরের নাসাকর্তনের ব্যাপারটা।

কিন্তু তাঁরা ভুলে গেলেম জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর, মহাম্মদী বেগ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদেরকে হাতে করে কী ভাবে আত্মসাৎ করলেন ভারতবর্ষকে। তাঁরা ভেবে দেখলেন সিরাজকে আর কোন ব্যক্তির হাতে হত্যা করালে হয়তো ভারতের মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তাই আর কাউকে না পেয়ে পেলেন বুদ্ধিহীন মহম্মদী বেগকে — যাও মুসলমান হয়ে বসিয়ে দাও মুসলমানের বুকে তরবারী।

কিন্তু তাঁরা একবারও ভেবে দেখলেন না যে একদিন তাঁদের সমস্ত কুটবুদ্ধির চাল একে একে ধরা পড়বে সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ প্রভৃতির চোখে চোখে আর সমগ্র ভারতের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একদিন প্রতিশোধ নেবে পলাশী যুদ্ধের বিন্দু বিন্দু হিসেব-নিকেশ।

হন্টার সাহেবও বেশ সুন্দর ভাবে দানশাহর উপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে সাধু সেজেছেন। দানশাহ যদি সিরাজকে ধরিয়ে দিয়ে মীরজাফরের নিকট থেকে বহুমূল্য জায়গীর লাভ করে থাকতেন তাহলে মালদহের ক্যালেক্টরীতে তার নিশ্চয়ই রেকর্ড থাকতো—এ কথা শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

শিষ্য যে নাসাকর্তন করাবেন পীরের এবং পীর যে প্রতিশোধ নেবেন শিষ্যের, ইংরেজরা এ কথা জানতেন না যে, উভয়ের উপর এই দোষ চাপালে একদিন জন সমুদ্রে ভুয়ারূপে প্রমাণ পাবে। তাঁরা জানতেন না যে সিরাজ একজন ধার্মিক-ধর্মপ্রাণ, ইসলামে দীক্ষিত ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন মতেই বিশেষ করে একজন বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ পীরের নাক-কান কাটাতে বা কাটতে পারেন না। এমন কি পীরের প্র.ত কোন অশোভনীয় আচরণও করতে পারেন না। যিনি পীরের আধ্যাত্মিক গুণে মুগ্ধ হয়ে বিরাট সাহাপুর জমিদারী, জলকর, বহুমূল্য নিষ্কর সম্পত্তি দান করতে পারেন তিনি কখনই সেই পীরের উপর কোন অশোভনীয় আচরণ করতে পারেন না।

আর এ কথাও ঠিক যে. পীর পয়গম্বর সাধু প্রভৃতির চারিত্রিক গুণই

হল অপরাধীকে ক্ষমা করা। তাঁরা পৃথিবী পৃষ্ঠে আসেন পথভ্রষ্ট মানুষ দেরকে সুপথে পরিচালিত করার জন্যে। আসেন ইহকাল পরকালের সুখভোগ করাবার নিমিত্তে। কেউই কারো উপর প্রতিশোধ নিতে আসেন না। যদি তাই হত তাহলে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) শত শত অত্যাচারী অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে বুকে জড়িয়ে ক্ষমা করতেন না।

অতএব এ ক্ষেত্রেও হজরত পীর দানশাহ (রহঃ) জীবিত থাকলেও. সিরাজ যদি তাঁর কাছে অপরাধী হয়েও থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য সিরাজকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এই বিপদে শিষ্যকে বাঁচাবার একটা পথ অবলম্বন করতেন, যদিও সর্বজীবের আয়ু বিধাতার হাতে।

'মালদহ প্রদর্শিকা' যখন আমার হাতে আসে তখনি অবাক হয়েছিলাম তার ৩২ নং পৃষ্ঠা দেখে। ছুটে গিয়েছিলাম যিনি অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয়ের সেই প্রাচীন ইতিহাস 'সিরাজদৌলা' পড়েছিলেন তাঁরই কাছে। যিনি বা যাঁরা এই উক্ত ইতিহাস পড়েছিলেন তাঁরাও সবাই অবাক হন মালদহ প্রদর্শিকার পৃষ্ঠা দেখে। যাই হোক আমাদের রতুয়া নিবাসী সাহিত্য রসিক শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আসরাফউদ্দিন নিজামী সাহেব বলেন, এই দানশাহর ব্যাপারে আমি অনেক কষ্টে অনেক দিন আগেই অক্ষয় বাবুর সিরাজদৌলা সংগ্রহ করে পড়েছি। তাতে জেনেছি সিরাজ যখন ধরা পড়েন তার অনেক আগেই দানশাহ পরলোকগমন করেন।'

তাই ডঃ ফণী পাল মহাশয়ের মালদহ প্রদর্শিকা পাঠ করে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, যদিও এখন পর্য্যন্ত অক্ষয় বাবুর সেই ইতিহাস পড়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার তথাপি দয়া করে উক্ত ইতিহাসখানা সংগ্রহ করে দেখুন। আর যদি কোথাও পান তাহলে দয়া করে অন্ততঃ আমাকে জানাবেন যে সিরাজকে ধরিয়ে দেওয়ার মূলে দানশাহ না অন্য কেউ।

যাই হোক কিছুদিন বাদেই মাননীয় পাল মহাশয় অতি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, 'আমি সেই ইতিহাস সংগ্রহ করে পড়েছি এবং জানতে পারলাম যে, সিরাজ যখন ধরা পড়েন তার আগেই দানশাহ পরলোক গমন করেছিলেন।'

পাল মহাশয়কে ধন্যবাদ যে, অতি দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন। কারণ তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর লেখাটি সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। আর ভুল হওয়াটাও স্বাভাবিক যে এখনো অনেক লোকের মুখে একটা বদ্ধ ধারণা জন্মে আছে দানশাহ-ই নাকি সিরাজকে ধরিয়ে দেন। আর সেই সূত্রে প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজন ডঃ ফণী পাল মহাশয় তাঁর মালদহ প্রদর্শিকায় বক্তব্যখানি তুলে ধরেন। আমি জানি তিনি কোন বিদ্বেষ ও আক্রমণাত্মক ভাবধারা নিয়ে দানশাহকে আক্রমণ করেন নি, কেননা তিনি এই ব্যাপারে পরে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন। আর আমিও কোন বিদ্বেষ বা আক্রমণাত্মক ভাবধারা নিয়ে পাল মহাশয়কে আক্রমণ করিনি, কেননা তিনি আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজন। তিনি যে কষ্ট করে আমায় জানিয়েছিলেন এর জন্য আজও আমি তাঁর কাছে ঋণী হয়ে আছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রথযাত্রা ১৩৮৭-তে যখন 'মালদহ প্রদর্শিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল, তখন উক্ত পুস্তিকার ৩৫নং পৃষ্ঠায় বাহারাল গ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে গিয়ে পূর্ব প্রকাশের হুবহু ছাপা হল কেন তার আদি-অন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

যাই হোক এখন আসা যাক খোসবাগে দানশাহের সমাধির ব্যাপারে। প্রভাত বাবু কোন্ দানশাহর সমাধির কথা লেখেছেন? হজরত পীর দানশাহর না অন্য কারুর? যদি হজরত পীর দানশাহ হন তাহলে তাঁর সমাধি তো রয়েছে আজকের রতুয়া থানার আলপাড়া মৌজার তালবনা নামক জায়গায়! এ কোন্ সমাধির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন?

পাঠকগণ একটু ভাবুন! এখনো যদি কেউ মুর্শিদাবাদে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনে যান আর আপনাদের সাথে যদি সেখানকার কোন গাইড থাকেন তাহলে দেখবেন, বিশেষ করে খোসবাগের সমাধিক্ষেত্রে পদার্পণ করলেই গাইড একটি কবর দেখিয়ে বলবেন ঠিক এই ধরনের কথা—ঐ যে কবরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই কবরটা হচ্ছে দানশাহ ফকিরের, যে ফকির নবাব সিরাজদৌলাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। নবাবকে ধরিয়ে দেওয়ার পর ফকির আনন্দ চিত্তে মীরজাফরের কাছে পুরস্কার গ্রহণ করতে

আসলে মীরজাফর পুরস্কারের পরিবর্তে ফকিরকে কতল করে এখানে তার কবর দেন।

পাঠকগণ! আরো লক্ষ্য রাখবেন আপনি যদি গাইডকে প্রশ্ন করেন —দানশাহর সমাধি তো মালদা জেলার রতুয়া থানার তালবনা নামক জায়গায়, এ কোন্ দানশা ফকিরের সমাধি ? তাহলে দেখবেন, গাইডের মুখ দিয়ে ঠিক এই ধরনের কথা উচ্চারণ হবে—আজ্ঞে, ওটা অন্য দানশাহ আর এটা অন্য দানশা ফকির।

আসলে এঁরাও জানেন না যে সিরাজের পীর হজরত দানশাহ ফকির সিরাজকে ধরিয়ে ছিলেন না অন্য কোন দানেশ নামীয় ফকির সিরাজকে ধরিয়ে ছিলো। আর খোসবাগে কবরটাই বা কোন্ ফকিরের তাও তাঁদের ভালভাবে জানা নেই।

যদি দানশাহর কৃত্রিম কবরই হয়ে থাকে তাহলে আমার তো মনে হয় এখানেও কিছু বিরাট রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। রহস্যটা তিন প্রকার হতে পারে।

(১) হয়তো সিরাজকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোন অর্থলোভী দানেশ নামীয় ফকির পুরস্কারের জন্য মীরজাফরের কাছে গেলে পুরস্কারের পরিবর্তে উপযুক্ত শাস্তি পাওয়ার পর খোসবাগে তার কবর দেওয়া হয় এবং এই দানেশ ফকিরই পরে দানশা ফকির নামে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

(২) নবাবের মৃত্যুর পর ভারতবাসী ক্ষেপে উঠতে পারে তাই বিশ্বাসঘাতকদের দল নিজের দোষকে চাপা দিয়ে খোসবাগে আলিবর্দী, সিরাজের পাশে একটি কৃত্রিম কবর তৈরী করিয়ে দেশবাসীর চোখে ভেঁাতা দিতে পারে যে, এই দানশা ফকিরই সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাই তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

(৩) হয়তো এমনো হতে পারে যে, হজরত দানশাহ (রহঃ) পরলোক গমন করলে তাঁর প্রিয় শিষ্য সিরাজ মালদহে এসে তাঁর পীরের সমাধির কিছু মাটি নিয়ে গিয়ে পীরের স্মৃতিস্বরূপ খোসবাগে কৃত্রিম সমাধি নির্মাণ করে থাকতে পারেন আর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা সমাধির পাশে গিয়ে প্রিয় পীরের পরমাত্মার শান্তি কামনা করে ফিরে আসতেন গৃহে।"

যাই হোক খোসবাগে দানশা ফকিরের কবরকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন, এই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্পষ্ট বলতে পারি যে খোসবাগের কবর হুজরত দানশাহ (রহঃ) এর নয় ; ওটা অন্য কোন কৃত্রিম ফকির-ফোকরার বা আর কিছু থাকতে পারে।

আজ হুজরত পীর দানশাহ (রহঃ) নন। নন তাঁর প্রিয় শিষ্য বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌলা। আজও তাঁর জন্যে কার না দু'ফোটা জল গড়িয়ে আসে চোখের কোণে ! মর্মান্তিক মৃত্যুকালীন অবস্থায় তিনি যখন বলেন—সুখে থাকো ভাইসব ! রইল দেশ, রইলে তোমরা ! এ দেশ তোমাদের-—একা হিন্দুও পারবেনা, একা মুসলমানও পারবেনা, হিন্দু-মুসলিম উভয়েই মিলিত হয়ে এ দেশ রক্ষা করবে। বিদায় দেশবাসী ! সেলাম ! বলুন কারনা দুঃখ হয়, কারনা হৃদয় কাঁদে সিরাজের বাণীর প্রতি !

আর দানশাহ ? আজ হুজরত দানশাহ (রহঃ) রয়েছেন সমাধিতে। রয়েছেন আমাদের চোখের আড়াল হয়ে আমাদেরই পাশে পাশে। আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাঁর বংশধরদের বংশানুক্রমে এক একটি মুখ। দেখতে পাচ্ছি সিরাজের দেওয়া সাহাপুর জমিদারীর নিস্কর জলকর সম্পত্তির জমি জায়গা। আজও দেখতে পাচ্ছি হাবেলি গ্রামে তাঁর বসতভিটার সংলগ্ন বসবাসকারী অনেক প্রজার ঘর-বাড়ী। আজও তাঁর বসতভিটার সেই নিমগাছের গোড়ায় পড়ে আছে তাঁর প্রিয় পাথরের টুকরোদ্বয়। যখনি সেই পবিত্র পাথরকে দেখার ইচ্ছে হয় তখনি বাড়ী থেকে দেখে আসি মিনিট খানেকের মধ্যে।

আর তাঁর সমাধি ? আজও জাতি-ধর্মনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম সবাই সমাধির পাশে গিয়ে মানত করে আসেন যার যা ইচ্ছা। আবার মহানন্দে একদিন পরিশোধ করে আসেন মানত। তেলাওত হয় পবিত্র কোরআন শরীফ। মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় মিলাদে মাহ্‌ফিল। জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যক্ষেত্রে আমাকেও যাওয়া আসা করতে হয় পীরের প্রায় সমাধির পাশ দিয়ে। রোজ যাওয়া আসার পথে পীরের উদ্দেশ্যে সালাম জানাই সমাধির দিকে। রোজ রোজ মনে মনে ভাবি ঐ ফাঁকা

জায়গা অর্থাৎ ঢিবিটার কথা। রোজ মনে মনে বলি—হে সকল জাতির পীর। যারা তোমাকে চেনেনা জানেনা, যারা তোমার প্রতি রটিয়েছে কুৎসা—তাদের তুমি তোমার মহৎগুণে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

* ১৪—১৫ পৃষ্ঠায় 'গেউড়িয়া ইঁট'-এর পরিবর্তে 'গৌড়ীয় ইঁট' পড়তে হবে।

* কয়েক জায়গায় 'দানশাহ' নামের শেষে ভুলবশতঃ (রাঃ) ছাপা হয়ে গেছে। ওটা (রাঃ) হবেনা, হবে (রহঃ)।

* ৩৭ নং পৃষ্ঠায় এব্রাহিম খান-এর চার পুত্রের মধ্যে ৪র্থ পুত্র মোহাঃ তারিফ খান-এর পরিবর্তে মোহাঃ আরিফ খান পড়তে হবে।

* পাঠান পরিচিতিতে প্রেসে 'খাঁ' টাইপের অভাবে কোথাও 'খাঁ' আবার কোথাও 'খান' ছাপা হয়েছে। খাঁ, খান একই অর্থে ব্যবহৃত।

* ৫৪ নং পৃষ্ঠার শেষের দিকে 'জামাহিরগীর গৌস্বামী' ছাপা হয়ে গেছে। ওটা 'গৌস্বামী' হবে না, হবে 'গোস্বামী'।

* ৫৫—৫৬ পৃষ্ঠায় ভুলবশতঃ কয়েক জায়গায় 'ঔরঙ্গজেব' ছাপা হয়ে গেছে। ওটা 'ঔরঙ্গজেব' হবে না, হবে 'আওরঙ্গজেব'।